শ্রীশ্রীশ্যামলীলা তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী

শ্রীশ্রীশ্যামলীলা তত্ত্ব

অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ,
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিত
ধূলি সদৃশং বিচিন্তয় ।।

প্রণেতা

শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী

বাঁকুড়া জেলার

চারশত বৎসরের প্রাচীন

"শ্যামসুন্দর মন্দির"

ব্রজরাজপুর

হে গোবিন্দ রাখ চরণে—

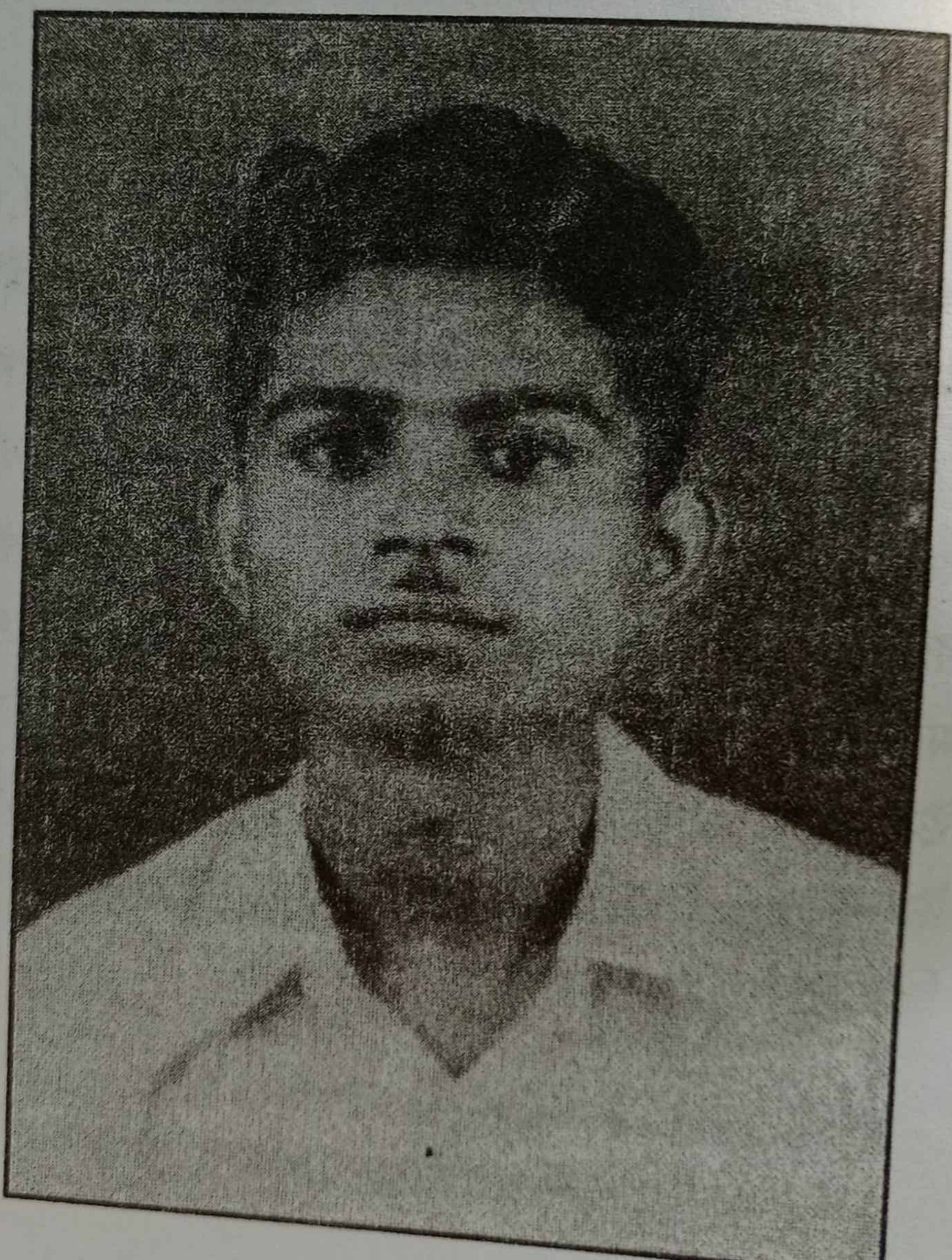

শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী

প্রকাশকের কলমে

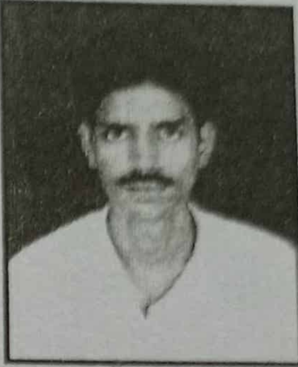

জানিনা — শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরের কি ইচ্ছা ! বোধহয় পূর্ব্ব জন্মের কোন সুকৃতির ফলে "শ্রীশ্রীশ্যামলীলা তত্ত্ব" বইটির প্রকাশকের ভূমিকায় আমাকে নিয়ে এলেন।

যে গ্রন্থরাজের অবলম্বনে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পদাশ্রিত ভক্তগণ নিত্যকাল আশ্রিত, সেই গ্রন্থ প্রকাশকের কলমে একটু বলা দরকার। ঈশ্বর স্বল্প সময়ের জন্য আমাদিগকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁহার রাজত্বে আমরা বিনা পয়সাতে আলো, জল, বায়ু পেয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু এত অযাচিত দয়া সত্ত্বেও আমরা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে তাঁহাকে একটিবারও ডাকি না বা স্মরণ করি না।

তবুও সেই পরমপিতা চিরকাল সমস্ত জীবকুলকে নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপালন করে আসছেন। সেই বিশ্বপিতার অবোধ সন্তানের প্রতি তাঁর কত অসীম দয়া। তাঁহার কারুণ্যের সীমা নেই।

কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদিগকে কোন জ্ঞান দিতে আসিনি। মাত্র প্রকাশকের কলমে একটু কঠোর সত্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

যাবার সময় মহাজনের একটি সতর্ক বাণী হঠাৎ মনে পড়ে গেল —

"সাধু সাবধান"

পরিশেষে সেই বিশ্ব নিয়ন্ত্রককে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই।

ইতি

অশেষ ধন্যবাদ

সূচীপত্র

১। প্রণাম ১
২। স্বরূপ বর্ণনা ২
৩। গ্রন্থ-সূচনা ৩
৪। দেবমাহাত্ম্য ৪
৫। মূর্ত্তি পূজা ৫
৬। লেখকের নিবেদন ৬
৭। পূর্ব্বভাষ ৮
৮। শ্যামসুন্দরের আগমন ১৭
৯। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের উপকরণ ২২
১০। মন্দির ২৩
১১। শ্রীমন্দিরের বিবরণ ২৪
১২। রাজা জগন্নাথের ইতিবৃত্ত ২৭
১৩। ধারাবাহিক ইতিহাস ২৯
১৪। নিত্যসেবার উপকরণ ৪০
১৫। ভেসা ভোগ ৪১
১৬। শ্রীশ্রীরাসযাত্রা সেবাপঞ্জি ৪২
১৭। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ৪৪
১৮। শ্রীশ্রীদোলযাত্রা সেবাপঞ্জি ৪৫
১৯। বন্ধ্যুৎসব ৪৭
২০। দোলযাত্রা ৪৯
২১। বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব ৫৭
২২। ভূমি অধিগ্রহণ ৫৮
২৩। বাসস্থান পরিবর্ত্তন ও উপাধিগ্রহণ ৫৯
২৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে যোগ-সূত্র ৬০
২৫। সখীদের সেবাপরায়ণতা ৬২
২৬। মঙ্গল আরতি ৬৩
২৭। প্রসাদ বৈশিষ্ট্য ৬৪
২৮। পূজক পরিচিতি ৬৫
২৯। মানুষ মন্দিরে কেন আসেন ৬৬
৩০। বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক পরিচিতি ৬৭
৩১। পথ নির্দেশ ৬৮
৩২। ঋণ স্বীকার ৬৯
৩৩। তীর্থ পর্যটন ৭০
৩৪। সেবা কমিটির অবদান ৭২

শ্যামসুন্দরের স্বরূপ বর্ণনা

হে গোলকবিহারী হরি শ্রীনন্দনন্দন
কৃপা কর মোরে, তোমার স্বরূপ করিতে বর্ণন ।।
যাঁর বিকশিত বদন-কমল সুষমায় ভরা
রূপের ছটায় অরুণ কিরণে হাসিছে বসুন্ধরা ।।
শিরোপরে শোভে ময়ূর পুচ্ছ ঈষৎ বামেতে হেলা
হসিত অধরে মুরলীর স্বরে নারী বিমোহন খেলা ।।
যাঁহার ইঙ্গিতে বহিছে সমীরে মলয় সুবাস
দুলিছে তাহাতে কর্ণ-কুণ্ডল উড়ে যায় পীতবাস ।।
ঐ পীতবাসে প্রভাতী সূর্য্য স্নিগ্ধ কিরণ ছড়ায়ে
রাঙ্গিয়ে দিয়েছ অপরূপ সাজে দিগন্ত-বলয়ে ।।
কস্তুরী-মিশ্র তিলক ললাটে শোভে অতি মনোহর
কম্বু-কণ্ঠের মধুর নিনাদে মাতায় রসিকবর ।।
কর্ণে পশিলে মোহিনীসুর সদা চঞ্চল করে মন
উদাস নয়নে সখীরা ব্যাকুল কোথা সেই প্রেমধন ।।
রাধিকা সুন্দরী বামেতে যাহার বসিয়া রত্নাসনে
ললিতা সখীরা – হাস-পরিহাসে চলে যে রম্যস্থানে ।।
আর ভক্তেরা চেয়ে থাকে তোমা' দরশন অভিলাষে
দয়া করে শ্রীচরণে স্থান দিও সেবক কৃষ্ণদাসে ।।

গ্রন্থ-সূচনা

গ্রন্থারম্ভে বন্দি আগে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের চরণ
যাঁহার অশেষ কৃপায় হয় এই গ্রন্থ লিখন।
অতঃপর প্রণমি আমি গুরু পরম পরায়
যাঁদের লেখনীতে কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়।
সেই সূত্র ধরে চলে নানা পুস্তক অন্বেষণ
যেথা পাব দাস গদাধরের পূর্ণ বিবরণ।
শাস্ত্রগ্রন্থে ধৃত যাহা তাহা আংশিক প্রকাশ
পাইনা কোথাও তাঁর পূর্ণ লীলার আভাষ।
প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল যারা তারা স্মৃতি রেখে যায়
নিষ্কামীরা আপনারে উৎসর্গে ঈশ্বরের পায়।
দাস গদাধর গোস্বামীর ছেলে বাণীকৃষ্ণ নাম
তাঁহার ছেলে মথুরানন্দ এনেছিলেন শ্যাম।
১০২২ সালে এলেন শ্যাম বৃন্দাবন থেকে
দেব দরশনে ভক্তগণ প্রেমানন্দে নাচে।
শ্যামলীলা তত্ত্বের কথা অতিমধুরিমা
জগতে বিদিত হউক প্রভুর মহিমা।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ বিশে মাঘ ১৩৯০ সালে,
রচিল 'কৃষ্ণদাস' স্মরিয়া সেই পরম দয়ালে।

লেখকের নিবেদন

মানুষ চিরকালই অনুসন্ধিৎসু। সে তাহার অতীতকে জানতে চায়, সে কোথা থেকে এসেছে। এই ধরনের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। ইতিহাস অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই অতীতের আলো দিয়ে ইতিহাস বর্তমানের পথ দেখায়। তাহারই অনুসরণ করে আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলি। কীর্ত্তি মানুষকে অমর করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঠিক কোথায় বসবাস করতেন তাহা আজ আর জানা সম্ভব নয়। কারণ বিগত পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের ইতিবৃত্ত কোন লেখক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে যান নাই। তাই এই শ্যামলীলা তত্ত্বের বিশদ বিবরণ দেওয়া আমার ন্যায় লঘুবিদ্য লোকের পক্ষে সাধ্যাতীত। একমাত্র শ্রুতি যুগযুগ ধরে এক প্রজন্মের পর অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। সেই সূত্র ধরে আমাদের ভাবীকালের বংশধরগণকে অন্ধকার থেকে কিছুটা আলোকে আনিবার অভিলাষে এবং বহু বিজ্ঞলোকের অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

লেখা বাহুল্য ..... গ্রন্থকর্ত্তা যখন গড়বেতা মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী তখন দেবমাহাত্ম্য পূর্ণ একটি ছোট পুস্তিকা পড়ে গ্রন্থকারের হঠাৎ মনে হয় আমাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরের ইতিহাস নিয়ে তো কোন গ্রন্থ নেই। অথচ তিনি স্বমহিমায় বিগত চারশত বৎসর ধরে নিত্যলীলা প্রকাশ করে আসছেন। বহু পূর্বে ঠাকুরের লীলা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাহাতে দেখা যায় ঘটনার কোন নির্দ্দিষ্ট সন বা তারিখ উল্লেখ নেই। এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতিহীন একটি প্রামাণিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন

ছিল। যাহা আমি আমার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম ভাগে উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপকরণ সংগৃহীত না থাকায় আমি তাহা লিপিবদ্ধ করতে পারি নাই। বহুদিনের সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ আমার ঊনপঞ্চাশতম জন্মদিবসে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের অশেষ কৃপায় তাহা পূর্ণ হল।

উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে বহু গ্রন্থের নানা সূত্র থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। অতীতের সেই সমস্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে পূর্ব্ব সূরীদের কথাপুষ্পগুলি যতদূর সংগ্রহ করতে পেরেছি তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলাম। আপনারা জানেন — বিনামূল্যের বই আজকাল কেহ পড়ে না। সেইজন্য যে কোন পুস্তকের কিছু একটা মূল্য থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে আপনাদের নিকট আমার নিবেদন ...... এই গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে অতীতের সেই লুপ্ত ইতিহাস যদি কাহারও নিকট পাওয়া যায় তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করব।

ইতি
শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী

গোলকপুর
পোঃ – ভেদুয়াশোল
জেলা ঃ – বাঁকুড়া
পশ্চিমবঙ্গ
২০শে মাঘ ১৩৯০ সাল

পূর্ব্বভাষ

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যুগ যুগ ধরে মানুষ তার জীবিকার প্রয়োজনে একস্থান পরিত্যাগ করে অন্যস্থানে বসবাসের জন্য চলে যায়। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ক্ষেত্রেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। অতীতের দিকে তাকালে জানা যায় কর্নাটিক প্রদেশ থেকে আগত সামন্ত সেনের পৌত্র শ্রীবিজয় সেন বঙ্গদেশের শূরবংশীয় দ্বিতীয় শূর পালের কন্যাকে বিবাহ করে এই রাঢ়দেশে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তখন থেকে তিনি বঙ্গীয় সম্রাট আদি শূর নামে খ্যাত। তাঁহার পৌত্র লক্ষ্মণ সেন যখন বাংলা ৬৬৪ – ৬৯০ সালে কনৌজের (উত্তরপ্রদেশ) গাহড়বাল বংশীয় রাজাকে পরাস্ত করেন তখন কনৌজ থেকে অনেক কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ এই দেশে চলে আসেন (চৈঃ চঃ পৃঃ ৫৯৪)। বহুল প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে নবম শতাব্দীতে গৌড়রাজ আদিশূর (বল্লাল সেনের মাতামহ) যাগযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কনৌজ থেকে কিছু কায়স্থ সন্তানের সঙ্গে যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সন্তানকে এই বঙ্গদেশের নদীয়া জেলায় এনেছিলেন (চৈঃ চঃ পৃঃ ৫৯৪) তাঁহারা হলেন : শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ দুবে, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় চৌবে, সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ পাঁড়ে, কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীদক্ষ মিশ্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ তেওয়ারী। তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীভট্টনারায়ণ দুবে বঙ্গদেশের প্রথমে নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পাটিয়ারী ও পরে বীরভূম জেলার বন্দ্যোঘাটি গ্রামে এসে বসবাস করেন। (মনোরমা) – পৃঃ ৬৭১)। ঐ গ্রামে বসবাস করে ভট্টনারায়ণ দুবে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করেন। তারপর ঐ বংশের মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র দাস গদাধর – ঐ উপাধি ত্যাগ করে গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ দুবে উপাধি থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করে গোস্বামী উপাধি ধারণ করেন।

এখানে কিছুদিন থাকার পর এঁদের কোন এক ব্যক্তি বন্দ্যোঘাটি গ্রাম ত্যাগ করে উন্দরা গ্রামে এসে বসবাস করেন। তখন থেকে আর ঐ বংশের সঙ্গে এঁদের কোন ধারাবাহিক (Authentical Proofness) যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। আমাদের অতীতকে নানারূপ ঘাত প্রতিঘাতে বিকৃত করে দিয়েছে। সেইজন্য আজকে আমরা সত্যকে সন্দেহ করি, ইতিহাসকে পুরাণ বলি, পুরাণকে উপকথা বলে উপহাস করি। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের পরিচয় অন্যের নিকট হতে সংগ্রহ করে থাকি।

আমাদের এই দাস গদাধর বংশের ইতিহাস প্রায় চারশত বৎসর হইল। সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ শ্রীদাস গদাধর গোস্বামীর বংশধারা যাহা শাস্ত্র-গ্রন্থে পাওয়া যায় — তাহা (Authentical Proofness) আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমাদের উত্তর-সূরীদের তাহাদের বংশধারা নিয়ে আর - আমাদের মত বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে না। সেই বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য আমার পিতা শ্রীকমলাপদ গোস্বামীর লেখা "শ্রীমদ্দাশ গদাধর - শাখা পরিচয়" গ্রন্থে আপনাদের বংশধারা, শ্যামের সেবা - রাস-দোল পঞ্জিকা ইত্যাদি দেখতে পাবেন।

এখানে রাঢ়দেশ সম্বন্ধে একটুকু জানা দরকার। তৎকালে রাঢ়দেশ বলতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীর হতে ছোটনাগপুরের মালভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে রাঢ়ভূমি বলা হত। বীরভূম জেলা, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জেলার কিছু অংশ নিয়ে এই রাঢ় অঞ্চল গঠিত হয়েছিল। কনৌজ থেকে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পরবর্তীকালে রাঢ় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলা হত। এঁদের বৃহৎ অংশ শাক্ত হলেও তাঁদের গৃহদেবতা বা কুলদেবতা রূপে এঁরা শ্যামচাঁদ, বৃন্দাবনচাঁদ, রাধাগোবিন্দ প্রভৃতি নামে বিষ্ণুর উপাসনা করেন। প্রায় প্রতি গৃহে কুলদেবতা বিষ্ণুর

প্রতিনিধি রূপে শিলার অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। এই রাঢ়ের লৌকিক দেবদেবীর প্রতীক সবই শিলাখণ্ডে। যথা – শিবের লিঙ্গ, বিষ্ণুর শালগ্রাম, ধর্ম্মরাজের সূর্য্যকান্ত।

মিঃ উইলিয়াম হান্টারের অভিমত হল – A later migration of Brahmans, circ - 900 AD represented by the Brahmans brought from Canouj by Adiswar --- King Adiswar of Gourh. অবশ্য বঙ্গে কনৌজ থেকে সমাগত ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বে বৈদিক ও সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বসতি স্থাপন করেছিলেন।

এই বন্দ্যোঘাটি গ্রামে কয়েক পুরুষ বসবাস করার পর এই বংশের শ্রীমাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার নবদ্বীপ কাটোয়া রাজপথের ধারে আকাইহাটি গ্রামে বসবাসের জন্য চলে যান। ইনি খবুই ভক্তিমার্গের লোক ছিলেন। তিনি নদীয়া জেলার নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত সুবল চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা রত্নাবতীকে বিবাহ করেন। ইহার কিছুদিন পর ৮৯৫ বঙ্গাব্দে শ্রীমাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। তাহার নাম রাখেন গোপাল। গোপাল অল্পবয়সে পিতৃহীন হন। ফলে মাতা রত্নাবতীর সাথে তিনি মাতুলালয় নবদ্বীপে চলে আসেন।

এখানে মাতামহ শ্রীসুবল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী যথাসময়ে নাতির স্কন্ধে উপবীত তুলে দেন। ইহার কিছুদিন পরে মাতা রত্নাবতীর দেহান্ত ঘটে। মাতৃ-পিতৃহীন গোপাল নবদ্বীপের টোলে বেশ কিছুদিন অধ্যাপনা করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিশু বয়সে মা ও বাবাকে হারিয়ে গোপাল সংসারের মায়াজাল পরিত্যাগ করে তীর্থ পর্যটনে বাহির হন। এমন সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে বৃন্দাবন হতে নীলাচলে এসে কাশী মিশ্রের ঘরে উঠলেন। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব। পরে শ্রীনিত্যানন্দ রায় ও শ্রীনিবাস আচার্য্যে

এক ধর্মীয় আখড়ায় উপস্থিত হন। সেই সময় জ্ঞান-পিপাসু 'গোপাল' উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে নীলাচলে আসেন। সেখানে তিনি ঐ মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু গোপালের নতুন নামকরণ করেন ...... 'দাস গদাধর'। ইনি আমাদের গোস্বামী বংশের প্রথম পুরুষ।

নীলাচলে ঐ ধর্মীয় সভায় কিছুদিন থাকার পর ১৪৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ৯১৯ বঙ্গাব্দে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ রায়, রামদাস (অভিরাম) ও দাস গদাধরকে সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ করে সংসার ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন। তখন গৌড় দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই জাতিত্রয় বহুদিন হতে কৃতবিদ্য শ্রেণীরূপে পরিচিত । সেই হেতু গৌড় দেশে প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য মহাপ্রভু অভিরাম ও দাস গদাধরকে শ্রীনিত্যানন্দের প্রচার সঙ্গী দিলেন। নীলাচল হতে গৌড় দেশে আসবার পথে (উত্তরবঙ্গ) শ্রীদাস গদাধর রাধা ভাবে মহা অট্টহাস্যে দধি বিক্রয়িনী হয়ে বাহ্য পরিচয় ভুলে গিয়েছিলেন। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫) গৌড় দেশে এসে সেখানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গঙ্গা তীরে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ঘরে সকলে বসবাস করেন। পরে মহাপ্রভুর আদেশে হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিশ বিঘা স্টেশনের নিকট সরস্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে প্রেমবাণী প্রচারের জন্য নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহে চলে যান। সেখানে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে অবস্থান করেন। পরে মহাপ্রভু পুনরায় দাস গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে যমুনার ঘাটে ইমলী (তেঁতুল) তলাতে আশ্রয় নিলেন। তাহার পর তাঁহারা প্রয়াগ হয়ে মথুরায় গেলেন। বৃন্দাবনে রূপসনাতনের কাছ থেকে মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে আসেন। সেখানে মহাপ্রভু দাস গদাধরের মুখনিঃসৃত ভাগবত শ্রবণ করতেন। জগন্নাথ দেউলে প্রবেশের-নানা রকম বাধা সত্ত্বেও মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে স্পর্শ করলেন এবং স্পর্শ করামাত্র তিনি অন্তর্ধান হলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু যখন এই কথা শুনলেন, তখন এক আকাশবাণী হল —

"শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর বচন
পরিণয় করি কর অপত্য সৃজন।।"

(চৈঃ ভাঃ পৃঃ ৩৯১

সেই আকাশ বাণী শুনিয়া নিত্যানন্দ প্রভু শালিগ্রামে হ হোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস হোড়ের উদ্যোগে নিত্যানন্দ প্রভুর "বসুধার সাথে বিবাহ হয় (ভক্তি রত্নাকর ১২ তরঙ্গ)। তখন হতে তি খড়দহেই বসবাস করেন। আর দাস গদাধর ও অভিরামকে তাহা মাতুলালয় নবদ্বীপে প্রেমবাণী প্রচারের জন্য পাঠালেন। হুগলী জেলা ঐ সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ ঠাকরের মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে গৌর নিতাই, গদাধর, গোপাল, রাধিকা ও উদ্ধারণ ঠাকুরের মূর্ত্তি বিদ্যমান গৌর, নিতাই ও গদাধর এই তিনটি মূর্ত্তি নিম কাঠের তৈয়ারী গোপাল ও রাধিকা পিতলের এবং উদ্ধারণ ঠাকুরের মূর্ত্তি অষ্টধাতু নির্মিত। মন্দির শীর্ষে এদের পরিচিতি হিসাবে লেখা আছে —

দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে গদাধর
মধ্যে ষড়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।। (চৈঃ চঃ পৃঃ ২৩০)

এই গ্রামটি তখন রাঢ় বঙ্গের রাজধানী ছিল।

একদিন প্রাচ্যভূমি চট্টগ্রাম থেকে মুকুন্দ দত্তের বাল্যবন্ধু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহার শিষ্যবর্গ নিয়ে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখন মহাপ্রভু নৃত্য গীত বন্ধ করে বিদ্যানিধিকে সাদরে আসন গ্রহণ করতে বললেন। তখন মুকুন্দ তাঁর বন্ধু গদাধরকে বললেন — "গদাধর পণ্ডিত শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বান্‌ছ তুমি মনে।।"

(চৈঃ ভাঃ পৃঃ ১৪৫)

তাহার পর তিনি গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন গদাধর পণ্ডিত (দাস গদাধর) – পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জ্ঞানের গভীরতা দেখে তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিলাষ হয়। পরে মহাপ্রভুর অনুমতি ক্রমে পুণ্ডরীকের কাছে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর দাস গদাধর নবদ্বীপ হতে কাটোয়াতে চলে আসেন। (ভক্তি রত্নাকর ৭ম তরঙ্গ)। কাটোয়ায় থাকাকালে সেখানের শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীদাস গদাধরের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। (চৈঃ চঃ পৃঃ ৪৪১)। নিত্যানন্দ প্রভু তখন এখানের শ্রীবিশ্বম্ভর চট্টো'র মাতৃহীন কন্যা মায়াদেবীর সাথে দাস গদাধরের বিবাহ দেন। বিবাহের পর বেশ কিছুদিন দাস গদাধর নবদ্বীপে বসবাস করেন। কিন্তু যবন শাসনকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহের সূচিতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় দাস গদাধর নবদ্বীপ হতে নৌকাযোগে গঙ্গার দক্ষিণ অভিমুখে রওনা হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এঁড়েদহ বা আড়িয়াদহের তৎকালীন জমিদার মল্লিক বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। এবং সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় একদিন রাত্রিকালে শ্রীদাস গদাধর এঁড়েদহ গ্রামের কাজীকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় কীর্ত্তন করতে করতে তাহার গৃহে উপস্থিত হন। এই কীর্ত্তন বিরোধী কাজীকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে কাজী বলেন — আমি আগামীকল্য "হরি" বলব। তখন গদাধর প্রভু প্রেমোল্লাসিত হয়ে বলেন —

.... আর কালি কেনে,
এইত' বলিলা হরি আপন বদনে।।

এঁড়িয়াদহে "দাস গদাধর" ভবনে তাঁহার প্রকট কালে বাল গোপাল মূর্ত্তি ছিলেন। (চৈঃ চঃ পৃঃ ১৯৮)। শ্রীদাস গদাধরের স্মৃতি বিজড়িত আড়িয়াদহ পাট বাড়ীতে এখনও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য

পূজার সাথে দাস গদাধরও পূজিত হন। শ্রীদাস গদাধর শেষ জীবনে শ্বশুরবাড়ী কাটোয়াতে বসবাস করেন। সেখানে কেশব ভারতীর সমাধির নিকট দাস গদাধরের সমাধি আছে। ওখান থেকে ভক্তেরা দাস গদাধর প্রভুর চিতাভস্ম এনে আড়িয়াদহে মাধবীলতা বেষ্টিত একটি উদ্যানে তাঁহার পুষ্পসমাধি দেন। বর্তমানে পাটবাড়ীর ট্রাষ্টি শ্রীকৃষ্ণকান্ত মল্লিক মহাশয় সব কিছু দেখাশুনা করেন।

দাস গদাধর মধুর রসিক ছিলেন। এখানে দাস গদাধরের সম্বন্ধে অনেকের অনেক কৌতূহল থাকতে পারে ...... এ কোন্ গদাধর ? আপনাদের প্রশ্ন অমূলক নয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দুইজন গদাধরের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা ..... (১) গদাধর পণ্ডিত (দাস গদাধর) (২) গদাধর গোস্বামী। ইঁহারা সকলেই বৈরাগ্য ধর্ম ও শুদ্ধ ভক্তি প্রচারার্থে মহাপ্রভুর পার্ষদ সঙ্গী ও প্রচার সঙ্গী ছিলেন। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় পূর্ব-পুরুষেরা পিতৃ উপাধি বর্জ্জন ও নতুন উপাধি গ্রহণ করে নিজ নিজ পরিচয় রেখে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ যেমন নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু নিজ নিজ উপাধি পরিবর্তন করে গোস্বামী হয়েছেন, তদ্রূপ শ্রীদাস গদাধরও পৈতৃক উপাধি পরিবর্তন করে গোস্বামী হয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে দাস গদাধরকে নিত্যানন্দের প্রচার সঙ্গী দিয়েছিলেন তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোক থেকে বুঝা যায়।

যথা ঃ— (১) গদাধর দাস শাখা সর্বোপরি
কাজীগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি।।
আঃ ১০। ৫৩।।

(২) রামদাস আর গদাধর দাস
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।।
আঃ ১১। ১৩।।

(৩) দাস গদাধর গোপীভাবে পূর্ণানন্দ
যাঁর ঘরে দাস কেলি-কৈল নিত্যানন্দ।।
আঃ ১১। ১৭।।

(৪) রামদাস, গদাধর আদি কতজনে
তোমায় সহায় লাগি দিলুঁ তোমা সনে।।
মঃ ১৫। ৪৩।।

(৫) রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর
মুরারী, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর।।
অঃ ৬। ৬১।।

শ্রী কবি কর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় লিখেছেন ঃ—

রাধা বিভূতি রূপা যা চন্দ্রকান্তি পুরা ব্রজে।
সঃ গৌরাঙ্গ নিকটে দাস বংশ্যো গদাধরঃ।।

(শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দকে মহাপ্রভু "কবিকর্ণপুর' আখ্যা দেন।)

ভোগ মালা পদ্ধতি পুস্তকে দেখা যায় — শ্রীল নরহরি বিরচিত "গৌরাঙ্গ বন্দনা"তে উক্ত হয়েছে ঃ—

দীনে দয়া কর ওহে মাধব রত্নাবতী।
তুয়া পুত্র গদাধর পদে রহুমতি।।
....
দাস গদাধর মোরে রাখহ চরণে।
না ভুলিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনে মরণে।।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলেছেন :—
তিন জন থাকেন নিরন্তর
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর।। (পৃঃ ৬৫)
....

গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত
শুনি প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ত।। (পৃঃ ৩০৬)

শ্রীদাস গদাধরের পুত্র বাণীকৃষ্ণ গোস্বামী নবদ্বীপের সরলাদেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম স্ফূরণ হত বলে পিতৃদত্ত নাম স্বার্থক হয়েছে। তিনি এই মায়িক জগতে তাঁর পাণ্ডিত্যের কিছু পরিচয় রেখে যান নাই। কারণ তিনি প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ছিলেন না। তবে নিঃসন্দেহে তিনি যে সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা তাঁহার ছেলেদের নামকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন। বাণীকৃষ্ণের দুইটি পুত্র, ঠাকুরানন্দ ও মথুরানন্দ। ঠাকুরানন্দ সংসার ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। আবার অনেকে বলেন ঠাকুরানন্দের বংশধর কাটোয়াতে আছেন। বর্তমানে ইহারা ঠাকুর বংশ নামে পরিচিত। মথুরানন্দ বেশী বয়সে বিবাহ করেছিলেন। মথুরানন্দ পিতৃহীন হয়ে এঁড়েদহ বা আড়িয়াদহ পরিত্যাগ করে মাতা সরলাদেবীর সাথে নবদ্বীপে (নদীয়া) মাতামহের বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। ইনি ছেলেবেলা থেকে গম্ভীর প্রকৃতির ও ভক্তি মার্গের লোক ছিলেন। সাধু সঙ্গ পেলে তাঁদের সাথে অষ্ট প্রহর শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন করে সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি নানা তীর্থ পর্যটন করতে করতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের যমুনা নদীর তীরবর্তী কোন এক গ্রামে এসে উপস্থিত হন। তখন সেখানের জমিদার শ্রীগঙ্গাধর চৌবে। পরদিন পরিব্রাজক মথুরানন্দ এই চৌবের ঠাকুর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। জমিদার তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরের নিত্য পূজা করে জলগ্রহণ করতেন। পরিব্রাজক মথুরানন্দ প্রত্যহ পূজার জন্য নানা রকম উপচার সংগ্রহ করে শ্রীমন্দিরে নিয়ে যেতেন এবং ঐ প্রাঙ্গণ হতে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে দর্শন করে পরিতৃপ্ত হতেন। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন মথুরানন্দ ঐ মূর্ত্তি পূজা করবার জন্য জমিদার চৌবে মহাশয়কে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চৌবে মহাশয় ঐ অপরিচিত ব্যক্তিটিকে পূজা করবার অনুমতি দিলেন না। ফলে মথুরানন্দ নিরাশ হয়ে দুঃখিত মনে নিজ ডেরায় ফিরে গেলেন।

—০—

শ্যামসুন্দরের আগমন

একদিন মথুরানন্দ বৃন্দাবনের গোবিন্দবাজার বা লুইবাজারে (বৃন্দাবনের সবচেয়ে বড় বাজার) মাধুকরী করতে করতে দেখতে পেলেন এক দোকানে নানাপ্রকার ঠাকুরের মূর্ত্তি বিক্রয় হচ্ছে। তা দেখে আশাহত মথুরানন্দের অন্তরে একটি শ্যামচাঁদের মূর্ত্তি কিনবার অভিলাষ জন্মে। তখন তিনি সেই দোকানে গিয়ে ঐ বিগ্রহের দাম জিজ্ঞাসা করায় দোকানী সন্ন্যাসীকে দেখে বলেন ঐ বিগ্রহের দাম একশত মোহর লাগবে। দাম শুনে মথুরানন্দ চিন্তা করলেন আমি একজন সন্ন্যাসী, এত মোহর কোথায় পাব ! এই কথা চিন্তা করতে করতে নিকটে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে বসলেন।

এমন সময় দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ, গৈরিক বসনে একটি লোক সন্ন্যাসীর নিকটে এসে বললেন, বাবা ...... কি ভাবছেন ? সন্ন্যাসী সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললেন। তখন সেই সৌম্য মূর্ত্তিটি বললেন উহার জন্য কোন চিন্তা নেই। ঐ বিগ্রহ কিনবার জন্য আমি আপনাকে মোহর দিব। আপনি কল্য সকালে এই বৃক্ষতলে থাকবেন। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই কথাটি শুনে মথুরানন্দ বিশ্বাস করতে পারলেন না। আবার লোভও সম্বরণ করা যায় না। যাই হউক পরদিন মথুরানন্দ অতি প্রত্যুষে সেই বৃক্ষতলে হাজির হলেন। বেলা বাড়তে লাগল, সূর্যদেব মধ্যাহ্নের ছায়া গুটিয়ে নিয়েছেন, সেই সৌম্য মূর্ত্তির দেখা নেই।

ফলে হতাশ হয়ে তিনি নিজ ডেরায় ফিরে যাবেন, এমন সময় সেই সুপুরুষটি একটি মোহরের থলি হাতে মথুরানন্দের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন এই থলিতে মোহর আছে, দোকানদারকে থলিটি দিবেন। তাঁহার যাহা দরকার নিবেন। বাকী মোহর থলিসহ আপনাকে ফেরৎ দিবেন, আর যখন আপনি ঠাকুরের মূর্ত্তিটি কিনবেন তখন দেখবেন ঘরের ঈশান কোণে একটি শ্যামচাঁদের মূর্ত্তি আছে এবং তাঁর মাথার উপরে দুইটি ভ্রমর অবিরত গুনগুন করে উড়ছে।

সেই মূর্ত্তিটি আপনি ক্রয় করবেন। এই বলে তিনি অন্তর্ধান হলেন। পরদিন মথুরানন্দ আনন্দ সহকারে শ্যামচাঁদকে ক্রয় করে ডেরায় ফিরলেন এবং বাকী মোহরগুলি ঘরে রেখে দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মথুরানন্দের মনে হল যুগলমূর্ত্তি ছাড়া পূজা হয় না। সেজন্য একটি রাধারাণীর মূর্ত্তি কিনবার স্পৃহা তাঁহার অন্তরে জাগে। কিন্তু ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তো হবে না ..... অর্থ চাই! একদিন তিনি ঐ অষ্টধাতু নির্ম্মিত রাধারাণীর মূল্য কত দোকানীর কাছে জানতে চাইলে দোকানদার সন্ন্যাসীকে দেখে একটুকু রসিকতা করে বললেন ..... রাধারাণীর যাহা ওজন হবে তাহার সমতুল্য মোহর আপনাকে দিতে হবে। ফলে নিরাশ হয়ে মথুরানন্দ চৌবের বাড়ীতে ফিরে এলেন।

পরদিন একটি ভিখারী মথুরানন্দের ডেরায় এসে বললেন ..... বাবা, আজ দুদিন হল আমি অভুক্ত অবস্থায় আছি। কিছু যোগাড় করতে পারি নাই! আমাকে কিছু সাহায্য করুন। মথুরানন্দ চিন্তা করলেন একেতো আমি সন্ন্যাসী, তার উপর আবার আমার কাছে ভিক্ষা চাইছে। বোধহয় গোবিন্দ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য এই ভিখারীটিকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

যাহা হোক মথুরানন্দ সেই মোহরের থলি হতে একটি মোহর ঐ ভিখারীটিকে দিলেন। ভাবলেন ...... আরও একটি মোহর কমল। তিনি কি করে রাধারাণীকে খরিদ করবেন চিন্তা করছেন। দু-একদিন পর সেই ভিক্ষুকটি এসে মোহরটি ফেরৎ নিতে অনুরোধ করলেন। বললেন — বাবা, আমি ঐ মোহরটি দ্বারা অনেক উপকার পেয়েছি। আপনি এই মোহরটি দিয়ে রাধারাণীকে খরিদ করতে পারবেন। শাস্ত্রে বলে ..... দানকরা জিনিষ ফেরৎ নিতে নেই। ভিখারীর ঐ লোভনীয় কথায় মথুরানন্দ হাসলেন। হয়ত ভাবলেন আমি একথলি মোহরে রাধারাণীকে কিনতে পারলাম না, আর ঐ ভিখারীটি বলে কিনা এই মোহরটি দোকানদারকে দিলেই আপনাকে রাধারাণীর মূর্ত্তিটি বিক্রয় করে দিবেন।

কিছুক্ষণ পরে মথুরানন্দ চিন্তা করলেন পরীক্ষা করে দেখাই যাক না কি হয়। এই বলে পরদিন মোহরটি সঙ্গে নিয়ে মথুরানন্দ সেই দোকানে গেলেন। দোকানদার সন্ন্যাসীকে দেখে পরিহাস করে বললেন ...... ঠাকুর মশায়, আজ তা হলে রাধারাণীকে নিয়ে যাবেন। দোকানদার মজা করবার জন্য একধারে রাধারাণীকে অন্যধারে ঐ মোহরটি পাল্লায় চাপালেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! দুইটি বস্তুই সমওজনের হয়েছে দেখে দোকানদার মাথায় হাত দিলেন। অবশেষে নিজের কথা রাখতে দোকানদার ঐ একটি মোহরের বিনিময়ে রাধারাণীকে বিক্রয় করতে বাধ্য হলেন। দোকানী লজ্জায় সন্ন্যাসীর পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মথুরানন্দ একই সঙ্গে সুদূর বৃন্দাবন হতে শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীকে বর্দ্ধমানের কাটোয়াতে নিয়ে আসেন। সেখানে বকুল তলায় দুই দিন বিশ্রাম করে বাঁকুড়া জেলার অধীন ওন্দার চার কিমিঃ উত্তরে অবস্থিত মাকড়কোল গ্রামে উপস্থিত হলেন।

এখানে কিছুদিন থাকার পর উক্ত গ্রামের অনতিদূরে উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত বোলাড়া গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে মথুরানন্দ সেখানেই বিগ্রহটিকে স্থাপন করলেন। বোলাড়া তখন জঙ্গলাকীর্ণ স্থান এবং রাজা বীর হাম্বিরের নাতি রাজা রঘুনাথ সিংহের অধীনে ছিল। তখন তিনি এক তরুণ সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা পেয়ে ঐ মূর্ত্তিটি জঙ্গল হতে বিষ্ণুপুরে আনবার জন্য মথুরানন্দকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সেবক মথুরানন্দ রাজার কোন অনুরোধ রাখলেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে রাজা ১০২৩ বঙ্গাব্দে ঐখানে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করে দেন। সেই সঙ্গে ঠাকুরের নিত্যসেবা চালাবার জন্য বৌলাড়া, মাদারডাঙ্গা ও চূড়ামণিপুর নামক তিনটি মৌজা নিষ্কর দেবোত্তর হিসাবে ঠাকুরকে দান করেন। দীর্ঘদিন ধরে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঐ মন্দিরে পূজিত হয়েছিলেন। কালক্রমে ঐ মন্দির সহ অন্যান্য গৃহগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে মথুরানন্দ বোলাড়া গ্রাম ত্যাগ করে আধ-কিলোমিটার দূরে মাকড়কোল নাম পাড়ায় একটি মন্দির তৈরী করে সেখানে শ্রীশ্রী৺রাধাশ্যাম বিগ্রহকে নিয়ে আসেন। এখানে কিছু

দিন থাকার পর ˝মথুরানন্দ স্থায়ীভাবে ১০৫১ বঙ্গাব্দে ব্রজরাজকে ব্রজরাজপুরে নিয়ে আসেন। সেই থেকে নাকি এই গ্রামের নাম হয় ব্রজরাজপুর। শোনা যায় — প্রত্যেক গ্রামের নামের পেছনে একটি করে ইতিহাস আছে। যেমন — মাকড়কোল। গ্রামটির অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী — ইনি "মাকড়চণ্ডী" নামে অভিহিতা। সেই জন্য মাকড়চণ্ডীর নাম অনুসারে এই গ্রামটির নাম হয়েছে মাকড়কোল। এখানে কোল অর্থে শান্তিপ্রিয়, নির্ভয় — চণ্ডীমায়ের কোল। তেমনি – ব্রজরাজপুর। এখানে ব্রজরাজ প্রথম পদার্পণ করেন। তাই এই গ্রামের নাম হয় ব্রজরাজপুর। পুর অর্থে নগর বা অধিষ্ঠান। অনুরূপ পাশের গ্রাম – বৃন্দাবনপুর। বৃন্দা শব্দের অর্থ – তুলসী। এখানে তুলসীর বন ছিল বলে এই গ্রামের নাম হয় – বৃন্দাবনপুর। আর তাহার পার্শ্বে গোলকপুর গ্রাম। গোলক অর্থে গুড়। পূর্বে এখানে প্রচুর আঁখের চাষ হত। প্রভু গুড়ের পীঠা, গুড়ের নাড়ু খেতে খুবই ভালবাসেন। তাই এই স্থানের নাম হয় – গোলকপুর। তাহার পর উক্ত গ্রামের উত্তরাংশে যুগনীগড়্যার সন্নিকটে একটি অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করেন। এখানে শ্যামচাঁদ কিছুদিন লীলা প্রকাশ করেন। পরে ব্রজরাজপুর মৌজার ১০৫৫ নং দাগের মধ্যস্থলে রাজার দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তির উপর ১০৫২ বঙ্গাব্দে একটি স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করেন। ঐ নব নির্মিত মন্দিরে অদ্যাবধি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, রাধারাণী ও সখী ললিতা শ্রীমন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করছেন। শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের পর শিষ্যগণের অনুরোধে বেশী বয়সে সেবক মথুরানন্দ বাঁকড়া জেলার অধীন ওন্দার সন্নিকটে দামোদরবাটিতে শ্রীবামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কনকলতাকে বিবাহ করেন। ইহাদের তিনটি পুত্র হয়। যথা ঃ– (১) শ্যামসুন্দর (২) নন্দকুমার ও (৩) রাধাগতি। মথুরানন্দ পুনরায় ১০৭২ সালে মাকড়কোলে চলে যান। সেখানে ১০৭৯ সালে শ্রাবণ মাসে শয়ন একাদশীর দিনে ৯৭ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মথুরানন্দের মৃত্যুর পর বড় ভাই অপর দুই ভাইকে কোন কারণে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ফলে ভ্রাতৃ বিরোধের উদ্ভব

হয়। তখন নন্দকুমার ১০৮০ সালের ফাল্গুন মাসের এক অন্ধকার রাত্রে গোপনে শ্যামচাঁদকে বীরভূম জেলার দীননাথপুরে নিয়ে যান। সেখানে শ্যামচাঁদ ছয়মাস থাকার পর নন্দকুমার মারা যান। তখন তাঁহার কোন এক শিষ্য শ্যামচাঁদকে ১০৮১ সালের শ্রাবণ মাসে পুনরায় ব্রজরাজপুরে নিয়ে আসেন।

সখী ললিতা সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত আছে। খাতড়ার রাজা শ্রীহরিশ্চন্দ্র ধবলদেব একদিন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নে নাকি শ্যামচাঁদ রাজাকে বলেছিলেন যে এখানে তাঁহার কোন সখি নেই! এই কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে রাজার ঘুম ভেঙ্গে যায়। রাজা সেই স্বপ্নের কথা কুলগুরুর নিকট প্রকাশ করায় তাঁহার উপদেশে নিম কাঠের একটি ললিতার মূর্ত্তি তৈরী করে দেন। তখন ঐ মূর্ত্তিটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শ্রীমন্দিরে শ্যামচাঁদের দক্ষিণে রাখা হয়। সেই থেকে অদ্যাবধি শ্যামের বামে রাধারাণী ও দক্ষিণে সখি ললিতা ভক্তগণকে দর্শন দিয়ে তাঁদের আনন্দবর্দ্ধন করছেন।

কেশবচন্দ্র ঘোষের "নিমাই চরিত" গ্রন্থে দেখা যায় ..... তিনি বিগ্রহের শ্রীচরণ দর্শনের সময় উল্লেখ করে বলেছেন ঃ- যে বিগ্রহের মঙ্গলারতি হয় সেই বিগ্রহ দর্শন করবার প্রকৃষ্ট সময় বেলা ১০টা ১০ মিনিট গতে আর যে বিগ্রহের মঙ্গলারতি হয় না সেই বিগ্রহ বেলা ৯টা ২৫ মিনিট গতে দর্শনের উৎকৃষ্ট সময়। মথুরানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দিরে তিন বর্ণের ৭টি শালগ্রাম আছেন। তন্মধ্যে একটি শশীবর্ণের অপরটি পীতবর্ণের। বাকী ৫টি কৃষ্ণবর্ণের। শশীবর্ণ ও পীতবর্ণের শালগ্রাম ২টি শ্রীমন্দিরের বাহিরে যান না। একমাত্র কৃষ্ণবর্ণের শালগ্রামগুলি প্রয়োজন বোধে শ্রীমন্দিরের বাহিরেও আগমন করেন।

হরিভক্তি বিলাসে উক্ত আছে যে ঃ-

"রিক্ত পাণির্ন অশ্যেত রাজনং ভিষজং গুরুং"।

অর্থাৎ রিক্ত হস্তে গুরু বা দেবাদি দর্শন শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের উপকরণ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জৈন আমলে তাঁরা বহু জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান শাসনকালে তারা অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ঐ পাথরে দেশের নানা স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। তার অনেক পরে যখন হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের বৈরী মনোভাব কিছুটা হ্রাস পেল তখন হিন্দুরা ঐ ভগ্ন জৈন মন্দিরের পাথরে দেশে অনেক শিব মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পাথরগুলি নির্দিষ্ট মাপের, গৈরিক রঙ্গের এবং গুটিতোলা। ঐগুলি দেখলে মনে হয় যেন কোন লোহার ছাঁচে তৈরী।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দপুর থানার অধীন পাঁচপুকুরিয়া মৌজায় "খাঁদারাণীর মন্দির", খাতড়া থানার অধীন মশ্যাড়ার সন্নিকটে "খাঁদারাণীর মন্দির" এবং তালডাংরা থানার অন্তর্গত হাড়মাসড়া গ্রামে সাত কোণা বিশিষ্ট ক্লোরাইট পাথরে নির্ম্মিত একটি "খাঁন্দাসিনী"-র মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশিষ্ট শ্রীহীন জৈন মন্দিরগুলি দেখলে মনে হয় তারা যেন অসহায় ভাবে উদগ্রীব নয়নে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আবার ইন্দপুর থানার অধীন দেউলভিড়া গ্রাম, ডাক বাংলা থেকে প্রায় দুই কিঃমিঃ পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের নামই তাহার পরিচিতি বহন করছে। দেউল মানে মন্দির আর ভিড়া অর্থে চূড়া। এখানে বহু জৈন ও বৌদ্ধ আমলের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং কিছু স্মারক–চিহ্ন বাঁকুড়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সংরক্ষিত আছে।

আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ধারণা সম্ভবতঃ কোন জৈন মন্দির হতে ঐ পাথরগুলি সংগ্রহ করে আমাদের শ্যামসুন্দরের মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়েছিল। অথবা নিকটস্থ কোন এলাকা থেকে ঐ ল্যাটেরাইট নামক শক্ত পাথরগুলি এনে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়েছিল। কারণ অনুরূপ ধরনের পাথর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

— ০ —

মন্দির

হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি সিন্ধুনদের পারসিক নাম থেকে (এরা-স,শ,ষ-কে 'হ' উচ্চারণ করত)। খ্রিষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে পারসিকরা সিন্ধুনদের আশেপাশে বাস করত। সেই সময়ই সম্ভবত এই নামের উৎপত্তি। আর্য ও অনার্য ধারার সংমিশ্রণে হিন্দু ধর্ম্ম ভারতের অন্যতম জাতীয় ধর্ম্ম হয়ে উঠেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বছর আগে হিন্দুদের বেদ্ রচিত হয়। বেদ্ শব্দ এসেছে বিদ্ শব্দ থেকে। বিদ্-এর অর্থ জ্ঞান। হিন্দু ধর্মের ভিত্তি হল এই বেদ্। চতুর্বেদ-এর মধ্যে ঋগ্ বেদ্ পৃথিবীর প্রাচীনতম শাস্ত্র। ভারতের আর্য্য ঋষিগণের উদ্ভূত মেধা হইতে ঋগ্‌বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি হিন্দুদের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখেছেন — One thing is certain, there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole world, than the hymns of the Rig-Veda.

যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অনুপ্রবেশ ঘটে তখন দেশে কোথাও কোন মন্দির বা মূর্তি ছিল না – ছিল আশ্রম। দেশের কোথায় প্রথম মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে ইতিহাসে দেখা যায় — গুজরাটে আরব সাগরের উপকূলে বিশাল প্রচীরে ঘেরা সোমনাথের মন্দির। ভগবান শঙ্কর এখানে অবস্থান করেন – সোমনাথ নামে। আরব সাগর বয়ে চলেছে মন্দিরের গা ঘেঁষে।

আর্য্য ধর্মের দ্রাবিড়ীকরণের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হোমের জায়গায় পূজার প্রসার। পূজা অর্থাৎ দেবদেবীর মূর্তিতে ফুল, ফল, পাতা ও জল দেওয়া হল দ্রাবিড়ীকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরে জমিদারেরা ব্রাহ্মণদের জমিদান করে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এবং দেশে বহু মন্দির নির্মাণ করেন। প্রাক্ আর্য্য সংস্কৃতির আর্য্য দেবতা হলেন শিব। এই দেবতাকে কোথাও বৃক্ষতলে, কোথাও নদীতটে আবার কোথাও মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। ভারতীয়দের অপরের ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করা বা তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় বিগ্রহকে নিজের ডান দিকে রেখে প্রদক্ষিণ করতে হয়। তৎপরে বিগ্রহকে বামে রেখে পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়।

— o —

শ্রীমন্দিরের বিবরণ

কালের স্রোতে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাস মরে না। এই শ্রীমন্দিরটির বয়স চারশত বছর অতিক্রান্ত হল। যাঁরা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা আজ আর ইহজগতে নেই। তবুও খোদাই করা প্রস্তর নির্মিত দক্ষিণ দুয়ারী মন্দিরটি যেন আজও মাথা তুলে তাঁর ভক্তগণকে আলিঙ্গন করছে। এই প্রস্তরগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে অনেকে বলেন কোন এক সময় বহু জৈন মন্দির ভেঙ্গে আমাদের দেশে অনেক দেবমন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দির গাত্রে তৎকালের অনেক কারু শিল্পের সমাবেশ দেখা যায়। মূল মন্দিরটি মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে ভূমি থেকে চার ফুট উচ্চে নির্মিত। মন্দিরটিকে প্রদক্ষিণ করার জন্য মন্দির চত্বরের চারধারে তিন ফুট চওড়া একটি পরিক্রমা পথ আছে। ভক্তেরা ঐ পথ পরিক্রমা করে আনন্দ উপভোগ করেন। মন্দির চূড়াতে তিন ফুট ডাইমিটারের প্রস্তরে খোদাই করা একটি পদ্মচক্র আছে। ঐ চক্রের উপরে লৌহ শলাকায় আর একটি ছোট লৌহচক্র আছে। ঐ লৌহচক্রটি নাকি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট থেকে মন্দিরকে রক্ষা করে।

ঐ শ্রীমন্দিরের পূর্বধারে একটি পাকা রসাঘর বা রন্ধনশালা আছে। সেখানে প্রভুর জন্য ভোগ, শীতল ইত্যাদি তৈরী করা হয়। ইহার ঈশান কোণে একটি পাকা পানীয় কূপ আছে। আটচালার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি অতি প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষটি শ্রীমন্দির নির্মাণের সময় রোপিত হয় বলে জনশ্রুতি আছে। প্রবীণ ভক্তেরা বলেন যে শ্যামচাঁদ নাকি সখীদিগকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যরাত্রে প্রতিদিন ঐ বৃক্ষতলে খেলা করেন। সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা

লেখনী মুখে দেওয়া অসম্ভব। তবুও কিছুটা প্রকাশের চেষ্টা করছি। ঐ সময় মন্দির চত্বরে মৃদু সমীরণে প্রবাহিত সুমধুর গন্ধ, নূপুরের শব্দ ও আলোক ছটায় এক অপূর্ব দৃশ্যের সমাবেশ ঘটে থাকে। বৃদ্ধ ভক্তদের মধ্যে দু একজন প্রত্যক্ষদর্শীও আছেন। ঐ আটচালাতে ভক্তগণ সমবেত হয়ে শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করে থাকেন। আটচালার দক্ষিণে দুই কুঠরী বিশিষ্ট একটি পাকা উত্তর দুয়ারী ভাড়ার ঘর আছে। এই বাড়িটি বারিদারগণ নিজ নিজ সেবাতে ব্যবহার করে থাকেন। ইহার জন্য তাঁদের কোন ঘরভাড়া লাগে না। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমাংশে একটি সিংহদ্বার বিশিষ্ট পূর্বমুখী পাকা কীর্ত্তনাগার আছে। এখানে ভক্তেরা পূর্বে কীর্ত্তন ও বিশ্রাম করতেন। মূল মন্দিরের বহিঃদ্বারে পশ্চিমাংশে একটি রাসমঞ্চ ও ইহার কিছু দক্ষিণে একটি দোলমঞ্চ আছে। এখানে প্রতি বছর কার্ত্তিকী পূর্ণিমান্ত প্রতিপদে শ্রীশ্রীরাস মহামহোৎসব এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমান্তে প্রতিপদে যে শ্রীশ্রীদোল মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। তাছাড়া যে প্রতিদিন ভক্তগণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর দর্শনে এখানে আসেন তাহা মন্দির চত্বরে বসানো মার্বেল পাথরে খোদিত ভক্তগণের নাম-ঠিকানা দেখলে বুঝা যায়।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরের শ্রীশ্রীরাস ও শ্রীশ্রীদোল মহামহোৎসবের সময় নিকটবর্ত্তী তেঁতুলিয়া গ্রামের লায়েক পরিবার ও তন্তুবায় গোষ্ঠি-মিলে একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই লায়েক পরিবার প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বা ঐ সময়ের কাছাকাছি তাঁরা মেদিনীপুর জেলার ছাতিমগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। যখন ভক্তগণ শ্যামচাঁদ, রাধারাণী ও সখী ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমন্দির হতে রাসমঞ্চ বা দোলমঞ্চে আসেন, তখন ঐ লায়েক পরিবার মশাল প্রজ্বলিত করে ভক্তগণকে পথনির্দেশ করে দেন।

আর সেই পথ অনুসরণ করে তন্তুবায় গোষ্ঠী শ্রীশ্রীঠাকুরের শিবিকাটি বহন করে শ্রীমঞ্চে নিয়ে যান। সেখানে শ্যামচাঁদ রাধারাণী ও সখী ললিতা ভক্তগণকে এক আধ ঘণ্টা দর্শন দিয়ে সেই শিবিকাতে সকলে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। ঐ শিবিকা বহনের জন্যে শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামী উভয় সম্প্রদায়কে খাতড়ার রাজার দেওয়া কিছু নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। আশা করি ইহাদের পরবর্ত্তী প্রজন্মেও গোস্বামী বংশের কুলদেবতাকে বহন করবার অধিকার অব্যাহত রেখে গোস্বামী পরিবারের স্নেহসিক্ত ছায়াতলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

— ০ —

যে প্রশংসার যোগ্য, তাহার
প্রশংসার চাহিদা থাকে না।।
—স্বামী রামসুখানন্দ্

রাজা জগন্নাথের ইতিবৃত্ত

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা ৯৭৪ সালে আকবর যখন মেবার আক্রমণ করেন তখন বহু রাজপুত চিতোর ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যান। রাজা জগন্নাথ ধবলদেব রাজস্থানের ঢোলপুরের বাসিন্দা ছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সময় রাজা জগন্নাথ ধবলদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা চিতোর ছেড়ে এই বঙ্গদেশে চলে আসেন। তারপর তাঁদের কোন ব্যক্তি পশ্চিমবাংলার ধলভূমের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার অধীন ইন্দপুর থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করেন। পরে গড়দুয়ারা ও ভোজদার পাহাড়ে শিবির স্থাপন করেন। ইহার কিছুদিন পর খাতড়া থানার অধীন সুপুর গ্রামে এসে সেখানের জমিদার চিন্তামণি রজককে প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তখন থেকে তাঁরা সুপুরে বসবাস শুরু করেন। ইহার বহুদিন পর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের দেবমাহাত্ম্য লোকমুখে শ্রুত হয়ে সুপুরের অধিপতি অপুত্রক রাজা জগন্নাথ ধবলদেব পুত্র কামনায় ১০২৫ সালে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরের পূজা দিবার জন্য মাকড়কোলের নিকট বোলাড়ার মন্দিরে আসেন। যথারীতি রাজা ও তিন রাণী উপবাস দিয়ে শুদ্ধ চিত্তে পূজার ষোড়শ উপচার সংগ্রহ করে শ্রীমন্দিরে এলেন। তিনি সেবক মথুরানন্দকে জানালেন যে তাঁদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি অপুত্রক ! আমার রাজ্য কে ভোগ করবে এই চিন্তা করে আমি মনে স্থির করেছি যে এই ঠাকুরের নিত্য সেবা চালাবার জন্য আমার ধলভূম সম্পত্তির একআনা অংশ নিষ্কর দেবোত্তর হিসাবে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরকে দান করব। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচালক শ্রীমথুরানন্দকে ঐ ভূ-সম্পত্তি দান করে দিয়েছিলেন। তাহার পর তিনি ঐ সম্পত্তি প্রজাবিলি করে দেন।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রী ঠাকুরের ইচ্ছায় রাজা জগন্নাথ ধবলদেবের একটি পুত্র হয়। তার নাম রাখেন "গোপীদাস"। আর জগন্নাথ ধবলদেবের অনুজ বিশ্বম্ভর ধবলদেবের পুত্র "ধর্মদাস"। ধর্মদাস গোপীদাসের চেয়ে অনেক বড়। ছেলেরা রাজকার্য্যে উপযুক্ত হলে মথুরানন্দের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর ধলভূম সম্পত্তির বাকী পনের আনা অংশ দুইভাই-এর মধ্যে ভাগ করে দেন। কালাচাঁদ বিগ্রহ সহ ধর্মদাস অম্বিকানগর মহল্লার ছয় আনা অংশ পেয়ে সেখানে বসবাসের জন্য চলে যান। আর খাতড়ায় একটি রাধাশ্যাম বিগ্রহ স্থাপন করে গোপীদাসকে খাতড়া মহল্লার নয় আনা অংশ দিলেন। তারপর রাজা জগন্নাথ ধবলদেব শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের চরণাশ্রিত হন। তখন তিনি বৌলাড়া গ্রাম থেকে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরকে নিজ রাজ্য খাতড়া মহল্লার অধীন ইন্দপুর থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গড়ের মন্দিরে আনার চেষ্টা করেন। ধর্ম্মদাস ও গোপীদাসকে রাজত্ব ভাগ করে দিয়ে বেশকিছু দিন রাজা তিন রাণীকে নিয়ে ব্রজরাজপুরের দক্ষিণে রামচন্দ্রপুর গড়ে এসে বসবাস করেন। পরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পুনরায় খাতড়া চলে যান।

— o —

ধারাবাহিক ইতিহাস

বাংলা ৮৯৫ সালে	শ্রীদাস গদাধরের জন্ম। তিরোধান ২৪শে কার্ত্তিক, গোপাষ্টমী। (পঞ্জিকাতে প্রাপ্ত)
বাংলা ৯৩৪ সালে	শ্রীবাণীকৃষ্ণের জন্ম।
বাংলা ৯৮২ সালে	শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামীর জন্ম।
বাংলা ১০২২ সালে	চল্লিশ বছর বয়সে মথুরানন্দ বৃন্দাবনের গোবিন্দ বাজার বা লুই বাজার থেকে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও রাধারাণীকে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অধীন ওন্দা থানার অন্তর্গত মাকড়কোল গ্রামে নিয়ে আসেন।
বাংলা ১০২৩ সালে	বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ মাকড়কোলের দক্ষিণে বৌলাড়া গ্রামে একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীকে নিয়ে আসেন। এখানে দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে ইঁহারা লীলা প্রকাশ করেন।
বাংলা ১০২৫ সালে	খাতড়ার রাজা জগন্নাথ ধবলদেব পুত্র কামনায় বোলাড়াতে শ্রাবণ মাসে শ্যামসুন্দরের পূজা দিবার জন্য আসেন।
বাংলা ১০৫১ সালে	শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামী বৌলাড়া থেকে ব্রজরাজকে ইন্দপুর থানার অধীন ব্রজরাজপুর গ্রামে নিয়ে আসেন। সেই থেকে নাকি এই গ্রামের নাম হয় ব্রজরাজপুর।
বাংলা ১০৫২ সালে	শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামী তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে শ্রীধাম

	ব্রজরাজপুর গ্রামের মধ্যস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। ঐ একই সময়ে শ্রীশ্রীরাস মন্দির ও শ্রীশ্রী দোল মন্দির নির্ম্মিত হয়।
বাংলা ১০৬৬ সালে (আনুমানিক)	মাকড়কোলের নাম পাড়াতে শ্রী "মথুরানন্দ গোস্বামী শ্রী শ্রী রাধাশ্যাম জীউ-এর একটি মন্দির তৈরী করেন।
বাংলা ১০৭২ সালে	পুত্র কলহের জন্য মথুরানন্দ পুনরায় মাকড়কোল চলে যান।
বাংলা ১০৭৯ সালে	মথুরানন্দ ৯৭ বছর বয়সে মাকড়কোলে দেহত্যাগ করেন। নাম পাড়াতে মথুরানন্দ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জীউ"-এর মন্দিরের পাশে তাঁর সমাধি মন্দির আছে।
বাংলা ১০৮০ সালে	ভ্রাতৃ-বিরোধের ফলে এক অন্ধকার রাত্রে মথুরানন্দের মধ্যম পুত্র নন্দকুমার বীরভূম জেলার দীননাথপুরে শ্যামচাঁদকে গোপনে নিয়ে যান। সেখানে শ্যামচাঁদ ছয় মাস থাকার পর নন্দকুমার মারা যান।
বাংলা ১০৮১ সালে	বীরভূম জেলার দীননাথপুর থেকে নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর কোন এক শিষ্য শ্যামচাঁদকে পুনরায় ব্রজরাজপুরে নিয়ে আসেন।
বাংলা ১০৯০ সালে	ঐ মন্দিরের কাছে শ্রী শ্রী মথুরানন্দ গোস্বামীর একটি সমাধি মন্দির তৈরী করা হয়।
বাংলা ১১১২ সালে	এই বংশের ওন্দা পল্লবের ষষ্ঠমাধস্তন পুরুষ

	শ্রীচরণ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাসযাত্রা মহামহোৎসব এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় শ্রীজনার্দ্দন গোস্বামী ও শ্রীমাধবিন্দ গোস্বামী শ্রীশ্রীদোলযাত্রা মহামহোৎসবের বিশেষ সেবার প্রচলন করেন।
বাংলা ১১৬৩ সালে	বৈশাখের অপরাহ্নে শ্রীমন্দিরে বর্গীর আক্রমণ।
বাংলা ১২১৯ সালে	এই বংশের নবমাধস্তন পুরুষ খালগ্রাম নিবাসী শ্রীবলরাম গোস্বামী। ইনি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরের কার্ত্তিক মাসের ২১শে হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই দশ দিন "শ্রীমঙ্গল আরতি" সেবার প্রচলন করেন। তদবধি তাঁর অধস্তনগণ এই নিয়ম সেবা পালন করে আসছেন। শ্রীমঙ্গল-আরতি হচ্ছে প্রত্যুষে ভগবানের সামনে বৃত্তাকারে প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রথম পূজার সূচনা, এই সময় প্রভুকে শঙ্খবাদ্য ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে শীতল নিবেদন করা হয়। তারপরে সমবেত ভক্তেরা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন।
বাংলা ১২৩৭ সালে	শ্রীদাস গদাধর তত্ত্ব জানবার জন্য লেখকের দাদামশায় শ্রীমণি গোস্বামী ব্রহ্মচারীবেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে একমাস থেকে পূর্ব্বাশ্রমে ফিরে আসেন।
বাংলা ১৩১৩ সালে	একদিন লেখকের দাদামশায় স্বর্গত বিহারীলাল গোস্বামী নিত্য অভ্যাস মত শ্রীমন্দির পরিক্রমা করছেন, এমন সময় বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর

গ্রামের শ্রীজানকীনাথ দে কর্ম্মকার মনদুঃখে পুত্র কামনায় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে ব্রজরাজপুর আসেন। স্বামী-স্ত্রীর এই আকুল আবেদনে প্রভু সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না। প্রভুর ইচ্ছায় বৎসরান্তে তাঁদের কোলে এল এক যমজ সন্তান। ছয় মাস পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মানত শোধ করবার জন্য ব্রজরাজপুর আসেন এবং প্রভুকে একটি মাথার চূড়া দিয়ে মানত শোধ করেন। পরে ছেলেদের নামকরণ করেন যথাক্রমে .... শ্যামসুন্দর ও মদনমোহন।

বাংলা ১৩১৫ সালে — শ্রাবণ মাসে কুলমুড়া গ্রামের উদয় সিংহ নামে এক ব্যক্তি শ্যামের গহনা চুরি করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। পরে হাকিম বসন্তবাবু একমাস জেল হাজতে রাখেন। তার দশ মাস পরে তিনি মারা যান।

বাংলা ১৩১৭ সালে — ২৭শে মাঘ শ্রীমন্দির প্রথম মেরামত হয়।

বাংলা ১৩১৮ সালে — খাতড়া মুন্সেফ কোর্টের নাজির শ্রীরেবতিমোহন গোস্বামী শ্রীশ্রীরাস ও দোলযাত্রা মহামহোৎসবের সময় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর রাধারাণী ও সখী ললিতাকে শ্রীমঞ্চে বহন করে আনবার জন্য একটি শিবিকা তৈরী করে দেন।

বাংলা ১৩২৭ সালে — শ্রীগোবিন্দ দাস তেওয়ারী ২৪ বছর বয়সে বৈরাগ্য গ্রহণ করে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের চরণাশ্রিত হন। সেই থেকে ইনি লোক

সমাজে "গোবিন্দ – বৈরাগী" নামে পরিচিত। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বাংশে তিনি একটি আশ্রম তৈরী করে সেখানে দীর্ঘ ৫১ বৎসর ধরে ভজন সাধন করেন। আশ্রমের সামনে একটি ফুলের বাগিচা তৈরী করে ফুল আহরণের চিন্তা দূর করেন। তিনি প্রত্যহ সকালে শ্রীমন্দির ধৌত করা, পুষ্প আহরণ করা, শ্রীশ্রী তুলসী চয়ন, ফুলের মালা গুম্ফন ইত্যাদি সেবাকার্য্যে সর্ব্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন।

বাংলা ১৩৩৫ সালে — এই বংশের শ্রীকেশবলাল গোস্বামীর কন্যা শ্রীমতী অম্বিকাদেবীর পুত্র পুয়াড়া নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র ঘোষাল ১৩৩১ সালে মাঘ মাসে ব্রজরাজপুরে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের পাদপদ্মে প্রপন্ন হন। ১৩৩৫ সালে তিনি শ্রীমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে মাধুকরী এবং কিছুটা পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই অর্থে একটি সিংহমূর্ত্তি সহ অতিথিশালা নির্ম্মাণ করে দেন। তিনি ১৩৪৯ সালে অপ্রকট হন।

বাংলা ১৩৩৬ সালে — ইহারই চেষ্টায় বাঁকুড়া নিবাসী শ্রদ্ধাবান শ্রীযুক্ত শিববখ্স বাজোরিয়া নিজ ব্যয়ে শ্রীমন্দিরের ঈশান কোণে একটি পানীয় জলের কূপ খনন করে দেন।

বাংলা ১৩৩৮ সালে — এই বংশের একাদশতম পুরুষ শ্রীনবকুমার গোস্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসত্যকিঙ্কর গোস্বামী শ্রীমন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণাংশে একটি "শম্ভু লিঙ্গ" স্থাপন

	করেন।
বাংলা ১৩৪০ সালে	এই বংশের ভালুকা নিবাসী ষটশাস্ত্রী বেদান্তরত্ন শ্রীগৌরচন্দ্র গোস্বামী যিনি "দাস গোবিন্দ" নামে পরিচিত। ইনি মাধুকরীর সাহায্যে শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ইটের প্রাচীর দ্বারা মন্দিরটি সুরক্ষিত করেন এবং শ্রীমন্দিরের দক্ষিণাংশে একটি করগেটের আটচালা তৈরী করে দেন। ঐ সময় তিনি "শ্রীশ্রীশ্যামলীলামৃত" নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
বাংলা ১৩৬২ সালে	২০শে জ্যৈষ্ঠ এই বংশের ভালুকা নিবাসী শ্রীগৌরগোবিন্দ গোস্বামী মাকড়কোল গ্রামে (ওন্দা থানা) শ্রীশ্রীমথুরানন্দ গোস্বামীর বাস্তুতে একটি তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করেন।
বাংলা ১৩৬৫ সালে	শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্রজরাজপুর নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীরবিপদ গোস্বামী, গোলকপুর নিবাসী শ্রীকমলাপদ গোস্বামী, শ্রীরামদাস গোস্বামী, বৃন্দাবনপুর নিবাসী শ্রীমতিলাল গোস্বামী, শ্রীগোরাচাঁদ গোস্বামী ও অন্যান্য গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণকে নিয়ে একটি সেবা কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি কিছুদিন চলার পর সেবা কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।
বাংলা ১৩৭৭ সালে	২রা মাঘ লেখকের দাদামশায় স্বর্গীয় বিহারীলাল গোস্বামীর শিষ্য ব্রজরাজপুর নিবাসী শ্রীরামগতি চট্টোপাধ্যায় শ্রীমন্দিরের

	মেঝেতে মোজাক ও ভিতর দেওয়ালের চারধার তিন ফুট মার্বেল পাথর বসিয়ে শ্রীমন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করেন।
বাংলা ১৩৭৮ সালে	গোলকপুর নিবাসী শ্রীরঘুবর গোস্বামী ১৩৪০ সালের তৈরি করগেটের রুগ্ন আটচালাটি ভেঙ্গে তৎস্থলে পাকা পিলার যুক্ত একটি ঢালাই আটচালা মাধুকরীর সাহায্যে নির্মাণ করে দেন। ইনি ৪১ বৎসর বয়সে গৌড়ীয় মঠের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘ ১৮ বৎসর দেশের বিভিন্ন মঠে কোষাধ্যক্ষ থেকে ঈশ্বর চিন্তায় কালাতিপাত করেন। পরে তিনি ৫৯ বৎসর বয়সে পূর্বাশ্রমে ফিরে গ্রামের অনতিদূরে গোস্বামী বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।
বাংলা ১৩৭৯ সালে	ব্রজরাজপুর নিবাসী শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ঐ আটচালার সংলগ্ন দক্ষিণে প্রায় দুই শতক ভূমি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরকে দান করেন। ১৩৬৫ সালের সেবা কমিটি একটি জরুরি অধিবেশনে গোলকপুর নিবাসী শ্রীকমলাপদ গোস্বামী ঐ ভূমির উপর দুই কুঠরি বিশিষ্ট একটি উত্তর দুয়ারি সেবা গৃহ বা ভাড়ার ঘর নির্মাণ করবার প্রস্তাব করলে ব্রজরাজপুর নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী ও বৃন্দাবনপুর নিবাসী শ্রীমতিলাল গোস্বামী তাহা সমর্থন করেন। পরে এই সমর্থিত প্রস্তাবটি গোলকপুর নিবাসী শ্রীরামদাস গোস্বামী

	সানন্দে গ্রহণ করে ঐ ভূমির উপর দুই কুঠরি বিশিষ্ট একটি উত্তর দুয়ারি পাকা সেবা গৃহ নির্মাণ করে দেন।
বাংলা ১৩৮৯ সালের	১২ই অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুরের সেবার কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখে পুনরায় সমস্ত বারিদারগণকে নিয়ে একটি নূতন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এবং কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় শিক্ষক শ্রী মহাদেব গোস্বামী (ছত্রবাইদ)।
	সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐ সেবা কমিটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।
বাংলা ১৩৯৫ সালের	চৈত্র মাসে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে ও চত্ত্বরে বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ নেওয়া হয়।
বাংলা ১৪০১ সালের	৭ই ফাল্গুন শ্যামসুন্দর সেবা কমিটির এক বাৎসরিক সাধারণ সভায় শ্রীমন্দির সংস্কারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং এই শ্রীমন্দির সংস্কারের ভার বাঁকুড়া তাঁতি পাড়া নিবাসী খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীঅশ্বিনীকুমার চঁদ মহাশয়কে দেওয়া হয়। তিনি যথাসময়ে শ্রীমন্দির মেরামত, রং এবং মন্দির চত্ত্বরের চারধারে মোজাকের কাজ সমাধা করে ১৪০২ সালের ২০শে আষাঢ় শ্রীমন্দিরটি সেবা কমিটির হাতে ছেড়ে দেন।
বাংলা ১৪০২ সালের	২২শে আষাঢ় পুনর্যাত্রার দিন সেবা কমিটি

যথারীতি যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, রাধারাণী ও সখী ললিতাকে শ্রীমন্দিরে নিয়ে যান।

বাংলা ১৪০৬ সালে — গ্রন্থকারের পিতা শ্রীকমলাপদ গোস্বামী ১৩৪০ সাল থেকে দীর্ঘদিন জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাদের গোস্বামী বংশের প্রথম পুরুষ শ্রীদাস গদাধর গোস্বামীর বংশধারা ঐ বংশের বহু প্রবীণ লোকের সহায়তায় সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে তাঁর জীবিত কালে তাঁর লেখা "শ্রীমদ্দাস গদাধর - শাখা পরিচয়" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি।

সাধারণতঃ পিতার অসমাপ্ত কাজের ভার ছেলের উপরই বর্ত্তায়। সেই সূত্র ধরে আমি স্বর্গীয় পিতার ঐ গ্রন্থটি প্রকাশ করি। পরে ঐ পুস্তকগুলি "শ্যামসুন্দর সেবা কমিটি"র হাতে তুলে দিলে তাঁরা সমস্ত বারিদারগণের মধ্যে ঐ বইগুলি বিতরণ করে দেন।

বাংলা ১৪০৮ সালে — চৈত্র মাসে শ্রীমন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম ধারের মরিচা ধরা প্রধান গেট দুটি পরিবর্তন করে তৎস্থলে দুটি নূতন গেট লাগানো হয়। গত আর্থিক বৎসরের বাজেটে ইহা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বাংলা ১৪১১ সালে — গুরুদেব শ্রীনিমাইচরণ গোস্বামীর অনুপ্রেরণায় বাঁকুড়া বনকাটি নিবাসী শ্রীশক্তিপদ মণ্ডল, শ্যামসুন্দর মন্দিরের নাটশালার জন্য একটি সিলিং ফ্যান দান করেন।

বাংলা ১৪১৪ সালের — ৭ই ফাল্গুন গোলকপুর নিবাসী ৺রঘুবর

	গোস্বামীর পুত্র শ্রীকোমল কান্তি গোস্বামী শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর ঠাকুরের সেবা পরিচালনার জন্য সেবা কমিটিকে ৫৫,২০০/- টাকা দান করেন।
বাংলা ১৪১৭ সালে	শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বধারে অবস্থিত ভূমির উপর শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর সেবা কমিটি ১,৭৫,০০০/- টাকা ব্যয়ে লোহার পরিকাঠামোতে অ্যাসবেষ্টারের ছাদন দেওয়া একটি ভোজনালয় নির্ম্মাণ করে দেন।
বাংলা ১৪১৯ সালে	ফাল্গুন মাসে দেওঘরিয়া নিবাসী শ্রীহরেরাম মুখার্জী শ্যামসুন্দর সেবা কমিটির অনুমতি ক্রমে শ্রীমন্দিরের প্রবেশ পথের বামধারে ফুল বাগিচাটির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি লোহার রেলিং দিয়া ঐ বাগিচার শোভা বৃদ্ধি করেন।
বাংলা ১৪১৯ সালে	শ্রীমন্দিরে Air Condition Machine বসাবার জন্য কালপাথর নিবাসী শ্রীকালিপদ বাগ মহাশয় শ্যামসুন্দর সেবা কমিটিকে ২৯,২১১/- টাকা দান করেন।
বাংলা ১৪২১ সালে	শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর সেবা কমিটি ১৪১৭ সালে নির্মিত ভোজনালয়টির পাশে অনুরূপ আর একটি ভোজনালয় প্রায় ২,২৫,০০০/- টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেন। এটীও বাঁকুড়া আশ্রমপাড়া নিবাসী শ্রীনয়ন কর্ম্মকার নির্মাণ করেন।
বাংলা ১৪২২ সালে	১০ই ফাল্গুন শ্যামসুন্দর সেবা কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীশ্রী ঠাকুরের অঙ্গসেবার উপকরণ

	স্বরূপ একটি উচ্চমানের ''চামর'' কমিটির হাতে তুলে দেন। যার মূল্য প্রায় ১০০০/- (এক হাজার) টাকা।
বাংলা ১৪২৩ সালে	জনড়া নিবাসী শ্রী স্বপন কুমার গোস্বামীর প্রচেষ্টায় বাঁকুড়া জেলা পরিষদ কর্ত্তৃক 'শ্যামসুন্দর রোড্'টি মন্দির পর্যন্ত সিমেন্ট ঢালাই, পানীয় জলের ব্যবস্থা, হাত মুখ ধোয়ার জন্য ভোজনালয়ের দক্ষিণ দেওয়ালে valve সংযুক্ত ১৫টি ট্যাপ (Tap) বসিয়ে জনসেবার একটি নিদর্শন রেখে গেলেন।
বাংলা ১৪২৫ সালে	৭ই ফাল্গুন "শ্যামসুন্দর সেবা কমিটি" একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। ঐ সভাতে শোনা যায় শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে যে ৭৮ শতক ভূমি আছে তাহা সমস্ত অংশীদারগণ বিক্রয় করিবেন। তখন সেবা কমিটির সদস্যগণ ঐ জমিটি ক্রয় করা নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তাহা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে অনুমোদন পায়। তখন উহা উচ্চমূল্যে ক্রয় করা হয়।
বাংলা ১৪২৬ সালে	(ফাল্গুন - চৈত্র) ব্রজরাজপুর শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর সেবা সমিতির এবং মাকড়কোল গ্রামবাসীগণের আর্থিক অনুদানে মাকড়কোল নাম পাড়ায় যে শ্রীশ্রী ৺মথুরানন্দের ভগ্নাবশিষ্ট সমাধি মন্দিরটি ছিল, সেখানে নতুন করে একটি মথুরানন্দের সমাধি মন্দির গ্রামবাসীগণের সহায়তায় তৈরী করা হয়।

—০—

নিত্যসেবার উপকরণ

পূর্বাহ্ণে ঃ গব্য ঘৃত ও লবণ সংযুক্ত এক পাই চিড়া ভাজা, তিন পাই মুড়ুকি, গব্য ঘৃতের মিঠাই দশটি, গুড়পিঠা দশটি ও অন্যান্য ফলমূলাদি।

মধ্যাহ্নে ঃ চার সের সুগন্ধি আতপ চালের ভোগ, নানাবিধ ব্যঞ্জন, চার পাই দুধের পরমান্ন, চিড়ার পিঠা ও অন্যান্য উপকরণ।

অপরাহ্ণে ঃ এক পাই চিড়া, এক পাই দুধ, তদ উপযুক্ত গুড়, ক্ষীর, ছানা, কলাপাকা ইত্যাদি।

সায়াহ্নে ঃ গব্য ঘৃত, লবণ মিশ্রিত এক পাই চিড়া ভাজা, তিন পাই মুড়ুকি, গব্য ঘৃতের মিঠাই দশটি, লুচি, কলাপাকা ইত্যাদি।

ভোগের পর যথাসাধ্য বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়, সন্ধ্যারতির পর শ্রীমথুরানন্দের স্বরচিত একটি ভজন গীত কীর্ত্তন করতে করতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন করে থাকেন।

— ০ —

ভেসা ভোগ

ভিয়ান করা দ্রব্যকে "ভেসা ভোগ" বলে। এই ভেসা ভোগ একমাত্র গোলকপুর ও হরিরামপুর গ্রামের বারিদারগণ শ্রীশ্রী ঠাকুর কে নিবেদন করে থাকেন।

দ্বাদশ অন্নের তালিকা ঃ—

মধ্যাহ্নে :

১। গব্য ঘৃত, লবণ, কাগজি সহ সুগন্ধি আতপের ভোগ	— —	হবিঅন্ন
২। দুধে সিদ্ধ আতপ	— —	পরমান্ন
৩। চিড়ার পিঠা	— —	পিষ্ঠান্ন

সায়াহ্নে :

৪। লুচি, সুজি ইত্যাদি	— —	পক্কান্ন
৫। মিষ্টি	— —	মিষ্টান্ন

বারিদারগণের :

৬। উষ্ণ চাউল সিদ্ধ	— —	দ্বিজঅন্ন
৭। জলে সিদ্ধ আতপ	— —	অন্ন
৮। দুধ, জল মিশ্রিত আতপ	—	পায়সান্ন
৯। আনাজ সহ সিদ্ধ আতপ	—	হবিষ্যান্ন
১০। জল, দুধ, ইক্ষু মূলা সহ আতপ	—	নবান্ন
১১। খিচুড়ি	— —	মকরান্ন
১২। ভাজা দ্রব্য	— —	পুষ্পান্ন

শ্রীশ্রীরাসযাত্রা সেবাপঞ্জি

মৎপিতা শ্রীকমলাপদ গোস্বামী কর্তৃক ১৩৩৬ সালের সংগৃহীত ও সম্পাদিত "শ্রীমদ্দাস-গদাধর শাখা পরিচয়" গ্রন্থ থেকে শ্রীশ্রীরাসযাত্রা মহামহোৎসবের চির নির্ধারিত বাৎসরিক সেবাপঞ্জি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। যথা ঃ

ওন্দা পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্র গোস্বামীর অধস্তনগণ প্রতি আট বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০৪–১২–২০–২৮–৩৬–৪৪–৫২–৬০–৬৮–৭৬–৮৪ .... ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ গোস্বামীর অধস্তনগণ অনুরূপ প্রতি আট বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন।

যথা ঃ ১৪০০–০৮–১৬–২৪–৩২–৪০–৪৮–৫৬–৬৪–৭২–৮০ ....।

ব্রজরাজপুর পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

শ্রীআনন্দমোহন গোস্বামীর বংশধরগণ অনুরূপ প্রতি আট বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০৬–১৪–২২–৩০–৩৮–৪৬–৫৪–৬২–৭০–৭৮ ....।

শ্রীলালমোহন গোস্বামীর অধস্তনগণ অনুরূপ প্রতি আট বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০২–১০–১৮–২৬–৩৪–৪২–৫০–৫৮–৬৬–৭৪ ....।

ব্রজরাজপুর পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

শ্রীরাধামোহন গোস্বামীর বংশধরগণ অনুরূপ প্রতি ছয় বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০১–০৭–১৩–১৯–২৫–৩১–৩৭–৪৩–৪৯–৫৫–৬১–৬৭ ....।

শ্রীভূবনমোহন গোস্বামীর বংশধরগণ অনুরূপ প্রতি ছয় বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০৩–০৯–১৫–২১–২৭–৩৩–৩৯–৪৫–৫১–৫৭–৬৩–৬৯ ....।

শ্রীমুরলীমোহন গোস্বামীর বংশধরগণ অনুরূপ প্রতি ছয় বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০৫–১১–১৭–২৩–২৯–৩৫–৪১–৪৭–৫৩–৬৯–৭৫ ....।

— ০ —

শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন নামে সখীদের সঙ্গে রাসলীলা করেন।

পূর্ণিমায় – শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেন রাধারাণীর সঙ্গে।

প্রতিপদে – শ্যামচাঁদ রাসলীলা করেন ললিতার সঙ্গে।

দ্বিতীয়াতে – রাধাবিনোদ রাসলীলা করেন ইন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে।

তৃতীয়াতে – বলরাম রাসলীলা করেন ইন্দুরেখার সঙ্গে।

চতুর্থীতে – রাধাগতি রাসলীলা করেন তুঙ্গ বিদ্যার সঙ্গে।

পঞ্চমীতে – রাধানাথ রাসলীলা করেন মাধবীর সঙ্গে।

ষষ্ঠীতে – শুভ্রমূর্ত্তিতে রাসলীলা করেন চন্দ্রকান্তির সঙ্গে।

সপ্তমীতে – গিরিধারী রাসলীলা করেন চন্দ্রাবলীর সঙ্গে।

অষ্টমীতে – মদনানন্দ রাসলীলা করেন ভূদেবীর সঙ্গে।

নবমীতে – মদনমোহন রাসলীলা করেন রঙ্গদেবীর সঙ্গে।

দশমীতে – শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সখীদিগকে নিয়ে রাসলীলা করেন। একে ভাঙ্গারাস বলে। পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ভাঙ্গারাস হয়ে থাকে।

বিঃ দ্রঃ — গোয়ালিয়রাধিপতি জিয়াজি সিন্ধিয়া বৃন্দাবনে বর্ষান গ্রামে গিরিধারী ব্রহ্মচারীর উপদেশ মত একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেই থেকে একে ব্রহ্মচারীর মন্দির বলে। এখানে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর রাস মহোৎসব হয়ে থাকে। এই "বর্ষান গ্রাম" বৃষভানু রাজার রাজধানী ছিল।

— ০ —

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপ কুমারীদের নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে আগামী শারদীয়া যামিনীতে আমার সহিত তোমরা বিহার করিবে। সেই সুখময়ী যামিনীতে মল্লিকা পুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হইলে ভগবান যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। রাসোৎসব আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপীকাদের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপীগণ মনে করিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকট রহিয়াছেন। রাস আরম্ভ হইলে তখন দেবতাদের বিমান থেকে রাসস্থলে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই সময় কামিনীগণের বলয়, নূপুর, কিঙ্কিনির শব্দ, ভুজ কম্পন, সহাস্য ভ্রূ-বিলাস, কম্পিত কুচযুগল, গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুন্তল দ্বারা গোপীকাদের বদন-কমল ঘর্ম্মাক্তি হইল। গোপীকাগণ নানা রাগে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শে আনন্দিত হইয়া গান আরম্ভ করিল।

ঐ নৃত্যগানে গোপীগণ পরিশ্রান্ত হওয়াতে কোন কোন গোপীর বলয়, বেণীবন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িলে এক গোপী মাধবের স্কন্ধ ধারণ করিলেন। অন্য এক গোপী গোবিন্দের গলদেশ বেষ্টন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে চুম্বন করিতে লাগিলেন। যখন গোপীগণ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল, তখন অলক ভূষিত কপোল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিবার পর, যখন তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই দয়ালু ভগবান প্রেমরসে গোপীকাদের মুখমণ্ডল মুছাইয়া দিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে রাসলীলা সমাপ্ত করিয়া গোপীগণ বাসুদেবের আদেশে তাহারা স্ব-স্ব-গৃহে প্রস্থান করিল।

— ০ —

শ্রীশ্রীদোলযাত্রা সেবাপঞ্জি

মৎপিতা শ্রীকমলাপদ গোস্বামী কর্তৃক ১৩৩৬ সালের সংগৃহীত ও সম্পাদিত "শ্রীমদ্দাস-গদাধর শাখা পরিচয়" গ্রন্থ থেকে শ্রীশ্রীদোলযাত্রা মহামহোৎসবের চির নির্ধারিত বাৎসরিক সেবাপঞ্জি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। যথা ঃ

গোলকপুর পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

শ্রীগোপীকান্ত গোস্বামীর অধস্তনগণ প্রতি ছয় বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০৩–০৯–১৫–২১–২৭–৩৩–৩৯–৪৫–৫১–৫৭–৬৩–৬৯–৭৫ ....।

হরিরামপুর পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

শ্রীদুলালচন্দ্র গোস্বামীর অধস্তনগণ অনুরূপ প্রতি ছয় বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০৫–১১–১৭–২৩–২৯–৩৫–৪১–৪৭–৫৩–৫৯–৬৫–৭১ ....।

ভালুকা পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

শ্রীশত্রুঘ্ন গোস্বামীর অধস্তনগণ অনুরূপ প্রতি ছয় বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০১– ০৭–১৩–১৯–২৫–৩১–৩৭–৪৩–৪৯–৫৫–৬১–৬৭–৭৩ ....।

জনড়া পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

৺মাধবিন্দু গোস্বামীর ছেলে শ্রীকিশোরীমোহন গোস্বামীর

অধস্তনগণ অনুরূপ প্রতি চার বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০০-১৬-২০-২৪-২৮-৩২-৩৬-৪০-৪৪-৪৮-৫২-৫৬-৬০-৬৪-৬৮-৭২ ....।

ব্রজরাজপুর পল্লবের অন্তর্গত ঃ—

"মাধবিন্দু গোস্বামীর ছেলে শ্রীদুলালচন্দ্র গোস্বামীর অধস্তনগণ অনুরূপ প্রতি চার বৎসরান্তর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। যথা ঃ ১৪০২-০৬-১০-১৪-১৮-২২-২৬-৩০-৩৪-৩৮-৪২-৪৬-৫০-৫৪-৫৮-৬২-৬৬-৭০ ......।

— ০ —

বহ্ন্যুৎসব

বহ্ন্যুৎসব মানে চাঁচর। চাঁচর কি তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। চাঁচর হচ্ছে দোলযাত্রার আগের দিনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা সায়ংকালের উৎসব। ঐ উৎসবের সময় কিছু ভৃষ্ট ধান্য (খই) যাত্রাপথের আগে আগে গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়ার রীতি ছিল। তখন ঐ স্থান কণ্টকাকীর্ণ ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল বলে তৎকালে সেখানে কোন রাস্তা ছিল না। তাই বোধ হয় গভীর জঙ্গলে পথ হারানোর ভয়ে ঐ প্রথার প্রচলন ছিল। কিম্বা কোন মাঙ্গলিক প্রথা হিসাবে যাত্রাপথে খই ছড়ানো হত। যাহা হউক ঐ ভৃষ্ট ধান্য ছাড়ানোর পর ধূপ, ধুনা, আবির ও শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি মাঙ্গলিক বাদ্যে মশাল প্রজ্জ্বলিত করে শ্রীবিগ্রহকে মন্দির হতে দুই কিলোমিটার পূর্ব্বে কাঁটাকুলি নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। পরে সেখানে শিবমন্দিরের সন্নিকটে এসে এই উৎসব সম্পন্ন হত।

শোনা যায় — এই প্রথা দু'এক পুরুষ চলবার পর তাহা কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তৎপরিবর্তে ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসাবে দুটি কৃষ্ণকায় শালগ্রাম শীলা বহন করে ঐ চাঁচর উৎসব অনুসৃত হয়ে থাকে। চাঁচর খেলে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমন করবার পর নানা রকম শীতল, ফলমূল, ছানা ইত্যাদি প্রভুকে নিবেদন করা হয়। পরে ঐ প্রসাদী শীতল ভক্তগণকে বিতরণ করা হয়। পরের দিন দোল উৎসব উপলক্ষ্যে বহু ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে। শ্রীমধুকৃষ্ণ গোস্বামী রচিত "হরিভক্তি কর্ণামৃত" গ্রন্থ থেকে জানা যায় দ্বাপরে ব্রজধামে "বলম্কিক" নামে একটি অসুর ছিল। ঐ বলম্কিকের পুত্র মেড়াশূর। চাঁচর খেলার সময় এই মেড়াশূর প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করত। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাধ্য হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিশক্তি একত্রিত করে ত্রিবিধ রূপে চাঁচরের সান্ধ্যকালে মেড়াশূরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

তারপর ঐ ত্রিশক্তি দ্বারা মেড়াশূরকে বধ করলেন। আজও সেই যুদ্ধের শেষ পরিণতি হিসাবে চাঁচরের দিনে দাহ্য পদার্থ দিয়ে মেড়াশূরের একটি প্রতিকৃতি তৈরী করে তাহা দাহ করা হয়। কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে দেখা যায় এই মেড়াশূরের প্রতিকৃতি দাহ করার সময় একটি পদ গাওয়া হত। যথা —

আজ আমাদের মেড়াপোড়া
কালকে হবে দোল,
পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে
বল হরিবোল।

সেই প্রথা আজও প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুসৃত হয়ে আসছে। চাঁচরের পরদিন ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে দোল বা হোলি উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। আবার দেখা যায় অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে "মদনোৎসব" নামে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। সেটিকে নাকি পরবর্ত্তীকালে লোকে দোলরূপে পরিণত করে তাহা শ্রীকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। যাহা হোক, ব্রহ্মার পাশাজল (বরফ জল), বিষ্ণুর কুম্‌কুম্ এবং মহেশ্বরের আবির রং নিয়ে হোলি খেলা আরম্ভ হয়। এই সময় মহাজনেরা একটি সুন্দর পদ গেয়ে থাকেন। যথা ঃ

আবির কুম্‌কুম্ পাশা জল কেলি
সে সব সমরে — তুয়া বনমালী,
জিনিবারে নারী, হোলি খেলা খেলি
— ব্রজপুর মাঝে ।।

— ০ —

দোলযাত্রা

দোল একটি সর্ব্বভারতীয় ভক্ত ও দেবতাদের মিলনের উৎসব। এই 'দোল' মাঘী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। এখন আর দোল উৎসব বৃন্দাবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি দ্বাপর যুগ থেকে চলে আসছে। বসন্তকালে প্রকৃতি যখন নানা রং-এ রঞ্জিত হয়ে ধরণীকে সাজিয়ে তোলে তখন এই সময় দেবতাদেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে। তাই বসন্তকাল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই উৎসব। বাংলায় এই উৎসবের নাম "দোলযাত্রা", উত্তর ও মধ্য প্রদেশে "হোলি" এবং দক্ষিণ ভারতে "মদন-দহন" বা "কামায়ন"। বিশেষ করে বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে দোল উৎসবের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এখানে 'দোল' বা 'হোলি' উপলক্ষ্যে ঐ দিন বহু রক্ষণশীল সমাজেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ দেওয়া হয়। উৎসবের ঐ রকম রাত্রি সমগ্র ইউরোপে বিদ্যমান।

উত্তর প্রদেশের ব্রজের যুবকেরা "বরসানে কি হোলি"তে আবির ছড়ানোর সাথে নাচতে নাচতে বরসান (শ্রীরাধার জন্মস্থান) গ্রামের দিকে যায়। এরা বরসনায় এসে নৃত্যরতা যুবতীদের মাথার ঘোমটা খুলে দেয় নৃত্য করতে করতে। তখন যুবতীরা লজ্জা-রক্ষার্থে হাতে ছোট-ছোট কাঠি নিয়ে নৃত্য করতে করতে অগ্রসর হয়ে যুবক-যুবতীদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আরও বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে ভারতের সর্ব্বত্র এই দোল বা হোলি উৎসব পালিত হয়। বাংলায় এই উৎসবের নাম "দোল"। মধ্যপ্রদেশে "হোলি", দক্ষিণ ভারতে "মদন-দহন" বা "সিঙ্গা", বিহারে "ফাগুয়া", রাজস্থানে "হোরি", ওড়িশায় "দোল উৎসব", গোয়াতে "শিমাগা" হরিয়ানায় বৌদি ও দেওর বন্ধু হিসাবে যে হোলি খেলে তার নাম "দুলারী হোলি", মথুরা, বৃন্দাবন,

নন্দগ্রাম, বারসনায় হোলি উৎসবকে "লাঠমার হোলি" বলা হয়। পঞ্জাবে শিখরা হোলিকে "হোলা মহল্লা" বলে। পাকিস্থানের সিন্ধু প্রদেশেও দোল উৎসব পালিত হয়।

এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে এই উৎসব পালিত হয়। যেমন —

১) আমেরিকায় নদীর ধারে রঙের পরিবর্তে গোবর জলে হোলি খেলা করে।

২) স্পেনে বুনাই শহরে আগষ্ট মাসের শেষের বুধবার হোলির রঙের মতো একটি রঙের ব্যবহার করে যে উৎসব পালিত হয় তাহার নাম "টোমটিন"।

৩) পোলাণ্ডে এই উৎসব মিলনের উৎসব।

৪) ত্রিনিদাদে এই দিনটিতে "জাতীয় ছুটি" থাকে।

৫) চেকোস্লোভাকিয়ায় একে অপরের গায়ে আতর জাতীয় সুগন্ধি ছিটিয়ে হোলি উৎসব পালন করে।

পশ্চিম বাংলার "দোল" উৎসবের যে কয়েকটি জেলার চিত্র পেয়েছি তাহা গ্রন্থে প্রকাশ করলাম। যথা —

১। কোচবিহার — কোচবিহারের "মদনমোহন" মন্দির দেবোত্তর ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে পলাশ তোলা পুজোর মাধ্যমে 'মদনমোহন' -এর দোলযাত্রা উৎসবের সূচনা হয়। দোলের আগের দিন এখানে বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচর খেলা হয়।

২। নদীয়া — এখানে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে পূর্ণিমাতে দোল উৎসবের রেওয়াজ নেই। মাঘী পূর্ণিমার ২৬ দিন পর একাদশী তিথিতে রাজবাড়ির "নাড়ুগোপাল"-এর একমাস ধরে উৎসব

হয়।

১) শান্তিপুর – এখানে প্রতিপদে "নাড়ুগোপালের" দোল উৎসব হয়। এই উৎসব একমাস ধরে চলে।

২) ফুলিয়া – এখানে প্রতিপদে দোল উৎসব হয়।

৩) মায়াপুর – এখানে উৎসবে কোন রঙ্ বা আবির ব্যবহার করা হয় না। এখানে "রাধামাধব" ও চৈতন্যের আরাধনা করা হয়। দেশ বিদেশের বহু ভক্ত এই আরাধনায় সামিল হন।

৩। বৰ্দ্ধমান — প্রায় চারশত বৎসর পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমানের মহারাজা এই দোল উৎসব আরম্ভ করেন। এখানে ভক্তেরা দোলযাত্রার দিন "সর্ব্বমঙ্গলার" মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। রাজপ্রথানুসারে ভক্তেরা "লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ"-এর মন্দিরে যেয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের চরণে আবির দেন। পরে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরের দিন হোলির উৎসব হয়ে থাকে।

৪। মেদিনীপুর — প্রায় চারশত বৎসরের পুরাতন "শ্রীগোকুলানন্দ জীউ"-এর মন্দির। এখানে মাঘী পূর্ণিমা থেকে পাঁচ দিনের মাথায় দোল উৎসব হয়ে থাকে। সেইজন্য লোকে একে পঞ্চম দোল বলে। এই জেলাতে বিভিন্ন স্থানে দোল উৎসব হয়ে থাকে। যথা —

১) গড়বেতা – এখানে দোলের আগের দিন চাঁচর খেলা হয়। পরের দিন দোল উৎসব হয়ে থাকে।

২) দাঁতন – এখানে মহেশপুর গ্রামে দোল উৎসব হয়ে থাকে।

৩) তমলুক – রাজবাড়িতে গৃহদেবতার পায়ে আবির দিয়ে দোল উৎসবের সূচনা হয়।

৪) বগড়ি – বগড়ি কৃষ্ণনগর থেকে দুটি আলাদা পালকি করে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী রঘুনাথ বাড়ির দোল মন্দিরে যান। সেখানে ৮ দিন থাকার পর পুনরায় পালকি করে মন্দিরে ফিরে আসেন।

৫) এগ্‌রা — এখানে হট্টনগর মন্দিরে দোল উৎসব হয়। এই মন্দিরটি ১৫৬০ সালে তৈরী হয়। এখানে রাধা-কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে রঙ্ খেলেন "হর-পাৰ্ব্বতী"।

৫। বাঁকুড়া — ১) বাঁকুড়া সদর থানার অধীন পুরন্দরপুর গ্রামে রাধা-কৃষ্ণের (রসিকনাগর) পাঁচদিন ব্যাপী দোল উৎসব হয়। ঐ পাঁচদিন অন্নচ্ছত্রের ব্যবস্থা থাকে।

২) তালডাংরা থানার অধীন মাদারবনী গ্রামে প্রায় দুইশত বৎসর আগে ৺সৃষ্টিধর চক্রবর্ত্তী এই বংশী গোপাল জীউ-এর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পূর্ণিমা থেকে তিন দিন বংশী গোপালের দোল উৎসব হয়ে থাকে। শেষের দিনে রঙ্ খেলা হয়। পূৰ্ব্বে এই উৎসবে অন্নচ্ছত্রের ব্যবস্থা ছিল। পরে তাহা বন্ধ হয়ে যায়।

৩) ইন্দপুর থানার অধীন ব্রজরাজপুর গ্রামে "শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর মন্দিরটি" ১০২২ সালে ৺মথুরানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মাঘী পূর্ণিমাতে বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচর খেলা হয়। পরের দিন প্রতিপদে দোল উৎসব হয়ে থাকে। এই সময় শ্যামচাঁদ, রাধারাণী ও সখী ললিতা পালকি করে দোল মঞ্চে আসেন। তারপর দেবতাদের পায়ে আবির দিয়ে আবির খেলা শুরু হয়। এই সময় বহু ভক্তের সমাগম

হয়। তখন ভক্তদের থাকার অনেক অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধা লাঘবের জন্য "শ্যামসুন্দর সেবা কমিটি" একটি দ্বিতল পাকা বাড়ি নির্ম্মাণ করে দেন।

৬। হাওড়া —

১) শ্যামপুরের নিকট পিছলদল গ্রামের ছেলেরা দোলের তিনদিন পূর্ব্বে আবিরের রঙ্-এ মেতে উঠে। এই পিছলদল গ্রামে তমাল গাছের নীচে শ্রীমহাপ্রভুর একটি মূর্ত্তি আছে। সেখানে মহাপ্রভু ট্রাষ্টের উদ্যোগে ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে দোল উৎসব হয়ে থাকে।

২) বাগনান – এখানের ভূ-স্বামী শ্রীমুকুন্দপ্রসাদ রায় ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। এটী হাওড়া জেলার সব থেকে বৃহত্তম ও প্রাচীন মন্দির।

৩) উলুবেড়িয়া – এখানে পূর্ণিমাতে দোল হয়।

৭। মুর্শিদাবাদ — ইং ১৮৮৯ সালে চাঁচর খেলার সময় (মেড়াশূরের প্রতিকৃতি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে) কায়স্থ জমিদার বাড়ির সঙ্গে বৈদ্য জমিদার বাড়ির মামলা হলে প্রিভি কাউন্সিল উভয় পক্ষকে জানিয়ে দেয় যে দুদিন চাঁচর ও দোল উৎসব হবে। এই উপলক্ষে জেলাশাসক N.I. Act অনুসারে ঐ দুদিন সরকারী ছুটি দেন। প্রথম দিনে রঙ্ খেলা এবং দ্বিতীয় দিনে আবির নিয়ে খেলা।

৮। জলপাইগুড়ি —

১) এখানে বৈষ্ণব মতে দুদিন দোল উৎসব হয়। প্রথম দিনে আবির খেলা এবং দ্বিতীয় দিনে রঙ্ নিয়ে খেলা হয়।

২) শিলিগুড়ি – এখানেও অনুরূপ প্রথম দিনে আবির খেলা ও দ্বিতীয় দিন্ রঙ্ খেলা হয়।

৯। উঃ দিনাজপুর — এখানে দোল উৎসব দুদিন ধরে হয়ে থাকে। পূর্ণিমার দিন দেবতাদের শ্রীচরণে আবির দেওয়া হয়। এবং প্রতিপদে রঙ্ খেলা হয়। প্রথম দিনে মহাপ্রভুর নাট মন্দির যেমন কীর্ত্তনের আবহে ভেসে যায় তেমনি দ্বিতীয় দিনে গৃহদেবতার চরণে আবির দিয়ে শুরু হয় রঙ্ খেলা।

১০। দঃ দিনাজপুর — এখানে দুদিন ধরে দোল উৎসব হয়। রাধা-কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতাদের চরণে আবির দিয়ে দোল উৎসবের সূচনা হয়। প্রথম দিনে আবির খেলাকে কেন্দ্র করে যে খেলা হয় তাকে অনেকে “দেব দোল” বলে।

১১। দার্জ্জিলিং — এখানে কিছুটা বৈষ্ণব মতে দুদিন ধরে উৎসব হয়ে থাকে। প্রথম দিন ঠাকুরের চরণে আবির দিয়ে আশীর্ব্বাদ নেওয়া হয়। পরের দিন রঙ্ নিয়ে খেলা হয়। শিলিগুড়িতেও বৈষ্ণব মতে দুদিন রঙ্ খেলা হয়।

১২। মালদহ — এখানে দক্ষিণ দিনাজপুরের মত “দেব দোল” অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন দেবতাদের চরণে আবির দেওয়া হয়। পরের দিন রঙ্ খেলা হয়।

১৩। উঃ চব্বিশ পরগনা — কথিত আছে চারশত বর্ষ আগে দোলের সময় আবির ও কুমকুম্ রঙ্-এ লাল হয়ে যেত এই দিঘি। তাই এর নাম হয় “লাল দিঘি”। বর্তমানে যাহা বিবাদী বাগ নামে পরিচিত (সাবেক ডালহৌসি স্কোয়ার) সেখানে এই

দিঘিটি আছে। মহাপাত্রদের আড়াই শত বৎসরের পুরাতন "রাধা-বিনোদ" ও "মদনমোহন" মন্দির। এই দেউলে কষ্টিক পাথরে তৈরী শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতলের তৈরী শ্রীমতী রাধারাণী পূজিত হন।

এখানে কিন্তু চাঁচর খেলাটি অন্য রকম। পূর্ণিমার আগের দিন খড়ের চালা ঘরে নিয়ে আসা হয় – "রাধা-কৃষ্ণ"-কে। তারপর ঐ ঘরটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর বাহিরে আনা হয় ঐ যুগল মূর্ত্তি। দোলের দিন ঐ যুগল মূর্ত্তিকে বসান হয় দোলনায়। পূর্ণচন্দ্র দেখা গেলে দোলমঞ্চে আনা হয়। চলে আরতি, আবির খেলা।

২) খড়দহ — উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মানচিত্রে খড়দহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান। প্রভু নিত্যানন্দ বিবাহের পর এখানে এসে যে বাড়িতে থাকতেন সেটি কুঞ্জবাটি নামে পরিচিত। নিত্যানন্দের দ্বিতীয় পত্নির গর্ভে বীরভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি এখানে "শ্যামসুন্দর" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শ্যামসুন্দরের রাস ও দোল উৎসব উপলক্ষে প্রচুর লোকের সমাগম হয়ে থাকে। খড়দহের প্রচীন মন্দির হচ্ছে – রাধাকান্তের মন্দির। গঙ্গার পূর্ব্ব দিকে নাথুরাম ঘাটের আটচালা মন্দিরে রাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। আর আছে গোপীনাথের মন্দির, মদনমোহনজীর মন্দির,

কুঞ্জবাটির দামোদরজীর মন্দির ইত্যাদি। তবে খড়দহের বিখ্যাত দেবতা শ্যাম-সুন্দরজীর মন্দিরের ঔজ্জ্বল্য ও গরিমার কথা না বললেই নয়।

এছাড়া এখানে বহু ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান আছে।

শ্যাম-সুন্দরই এই খড়দহকে পরিচিতির আঙ্গিনায় দাঁড় করিয়েছেন। খড়দহের সবচেয়ে বড় গর্ব্ব হল — এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অবিরাম গতিতে বয়ে চলা পবিত্র গঙ্গানদী। গঙ্গাবক্ষে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় যার মায়াবী রূপ মানুষকে মুগ্ধ করে।

— o —

বাসস্থান পরিবর্তন ও উপাধিগ্রহণ

১। শ্রীভট্টনারায়ণ দুবে ঃ ইঁনি উত্তর প্রদেশের কনৌজ থেকে গৌড় বা রাঢ় দেশে (উত্তর বঙ্গ) বসবাসের জন্য চলে আসেন। তার পর তিনি স্থায়ীভাবে বীরভূম জেলার বন্দ্যোঘাটি গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। পরে তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করেন।

২। ঐ বংশের কোন ব্যক্তি এই বন্দ্যোঘাটি গ্রাম ত্যাগ করে বর্ধমান জেলার উন্দরা গ্রামে বসবাসের জন্য চলে যান।

৩। ঐ বংশের শ্রীমাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উন্দরা গ্রাম ছেড়ে বর্ধমান জেলার আকাইহাটি গ্রামে বসবাসের জন্য চলে আসেন।

৪। তস্য পুত্র শ্রীদাস গদাধর গোস্বামী পিতৃহীন হয়ে মামাবাড়ী নবদ্বীপে ও মাতৃহীন হয়ে শ্বশুরবাড়ী কাটোয়ায় কিছুদিন বসবাস করেন। তীর্থ পর্যটনের সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সান্নিধ্যে আসার পর তখন তিনি দাস গদাধরকে "গোস্বামী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাহার পর দাস গদাধর শেষ জীবনে কাটোয়াতে বসবাস করেন। এখানে দাস গদাধরের সমাধি আছে।

৫। ঐ পৌত্র শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামী পিতৃহীন হয়ে নবদ্বীপে মাতামহের বাড়ীতে বসবাস করেন। সেখান থেকে বৃন্দাবন ভ্রমণ করে বাঁকুড়া জেলার মাকড়কোল গ্রামে তৎপরে বোলাড়া গ্রামে এসে বসবাস করেন। পরে ঐ জেলার ইন্দপুর থানার অধীন ব্রজরাজপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে ইহার বংশধরেরা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে পনেরটি গ্রামে বসবাস করছেন।

— ০ —

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে যোগসূত্র

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঃ

১৪০০ শকাব্দে বাংলা ৮৮৫ সালে ২৮শে মাঘ বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে গম্ভুকাম নামে এক সন্ন্যাসী এই কুবের রায়ের নূতন নামকরণ করেন "নিত্যানন্দ"। ইনি ১৪৩০ শকাব্দে বাংলা ৯১৫ সালে নবদ্বীপে আসেন। ৪ বৎসর পরে ১৪৩৪ শকাব্দে নীলাচলে যান। সেখানে মহাপ্রভুর সাথে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঃ

১৪০৮ শকাব্দে বাংলা ৮৯৩ সালে ২৩শে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভু ২৬-২৭ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন হতে ভারতের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে ১৪৩৪ শকাব্দে বাংলা ৯১৯ সালে নীলাচলে এসে এক পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করেন। তারপর একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের এক ধর্মীয় সভায় মহাপ্রভু এসে উপস্থিত হন। ঠিক সেই সময় দাস গদাধর নানা তীর্থ পর্যটন করতে করতে ঐ আলোচনা চক্রে এসে যোগদান করেন। নীলাচলে ঐ বৈষ্ণবত্রয়ের শ্রীচরণ দর্শনে "দাস গদাধরের" তৃষিত হৃদয় কৃষ্ণরসামৃতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। তখন মহাপ্রভু গৌড় দেশে ভক্তি প্রচারের জন্য নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার সঙ্গী হিসাবে শ্রীঅভিরাম ও দাস গদাধরকে সঙ্গে দিলেন।

শ্রীদাস গদাধর গোস্বামী ঃ

১৪১০ শকাব্দে বাংলা ৮৯৫ সালে বর্দ্ধমান জেলার আকাইহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ইনি নীলাচলে নিত্যানন্দ প্রভুর সান্নিধ্যে এলে তখন তিনি "গোপালের" নূতন নামকরণ করেন "দাস গদাধর"। ইনি কাটোয়াতে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। পরে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে কিছুদিন নানা তীর্থ পর্যটন করেন। তাহার পর দাস গদাধর প্রভু শেষ জীবনে তাঁহার শ্বশুর বাড়ী কাটোয়াতে বসবাস করেন।

দাস গদাধরের তিরোভাব উপলক্ষ্যে মহন্ত হয়েছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু। এই উপলক্ষ্যে নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্‌মহাপ্রভুর বহু পার্ষদ উপস্থিত ছিলেন। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর সমাধির নিকট দাস গদাধর প্রভুর সমাধি আছে। গোপাষ্টমী দিনে তাঁহার তিরোভাব হয়।

— o —

চলুন ঃ আমাদের পূর্বপুরুষের নশ্বর দেহাবশেষ মিশ্রিত ভূমি দেখে আসি।
দক্ষিণেশ্বর Bus Stopage থেকে আড়িয়াদহ বাস।
বালী ব্রীজ পেরিয়ে গঙ্গার কিনারে।

—ঃ পথ নির্দেশ ঃ—

ব্রজরাজপুর কি করে যাবেন —

বাঁকুড়া শহর থেকে ব্রজরাজপুর যাওয়ার অনেক ব্যবস্থা আছে। খাতড়া, ঝিলিমিলি, মুকুটমণিপুর গামী যে কোন বাস ধরে ডাঙ্গারামপুর বাস ষ্ট্যাণ্ডে নামুন। পরে দক্ষিণদিকে একটুকু এগিয়ে এসে মোড়ে রিক্সা বা পায়ে হেঁটে পূর্ব্বদিকে (গুন্নাথ) রোড ধরে তিন কিলোমিটার এগিয়ে যান। ডানধারে একটি বাইপাশ রাস্তা আছে। ঐপথ ধরে হাফ্ কিলোমিটার গেলেই শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখতে পাবেন।

— ০ —

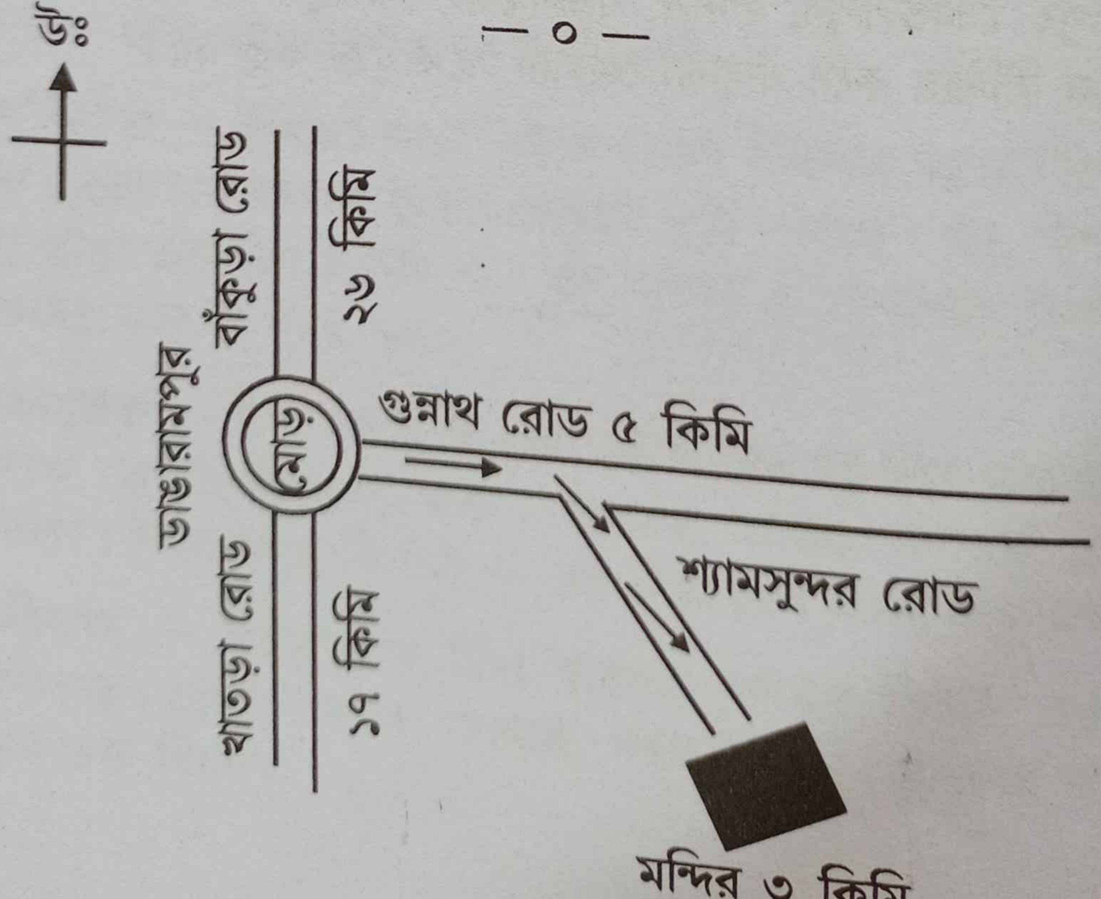

।। ঋণ স্বীকার ।।

গ্রন্থ থেকে ঃ—

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত।
৩। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।
৪। ভক্তি রত্নাকর।
৫। শ্রীশ্রীশ্যামলীলামৃত।
৬। ভোগমালা পদ্ধতি।
৭। ব্রজবার্তা।
৮। বর্তমান পত্রিকা।

তথ্য সংগ্রহ ঃ—

১। শ্রীসহদেব পণ্ডা (হেডমাষ্টার)
আড়িয়াদহ শ্রীবিদ্যানিকেতন, উঃ ২৪ পরগনা।
২। ডঃ গৌরাঙ্গ সুন্দর সুবুদ্ধি, প্রিন্সিপ্যাল
খাতড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া
৩। শ্রীকুমার শংকর নারায়ণ দেও
সাংবাদিক, অম্বিকানগর রাজ পরিবার।
৪। শ্রীনিমাই গোস্বামী, ব্রজরাজপুর।
৫। শ্রীমাধবচন্দ্র হাজরা, ১৩বি/১ অমূল্য চরণ পাল
ষ্ট্রীট, আড়িয়াদহ, কলিকাতা-৫৭।